আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

ড. আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

৪০৩২

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

الدعوة إلى الله تعالى

د/ أبو نصر محمد عبد الله جهانغير

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল-হামদু লিল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। ওয়াআলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

আল্লাহর পথে আহ্বান করতেই নবী-রাসূলগণের পৃথিবীতে আগমন। মুমিনের জীবনের আন্যতম দায়িত্ব এই দা'ওয়াত। কুরআনুল কারীমে এ দায়িত্বকে কখনো দা'ওয়াত, কখনো সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, কখনো প্রচার, কখনো নসীহত ও কখনো দীন প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ কাজের গুরুত্ব, এর বিধান, পুরস্কার, এ দায়িত্ব পালনে অবহেলার শাস্তি, ও কর্মে অংশগ্রহণের শর্তাবলী ও এর জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী আলোচনা করেছি এই পুস্তিকাটিতে। এ বিষয়ক কিছু ভুলভ্রান্তি, যেমন বিভিন্ন অজুহাতে এ দায়িত্বে অবহেলা, ফলাফলের ব্যস্ততা বা জাগতিক ফলাফল ভিত্তিক সফলতা বিচার, এ দায়িত্ব পালনে কঠোরতা ও উগ্রতা, আদেশ, নিষেধ বা দা'ওয়াত এবং বিচার ও শাস্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়, আদেশ নিষেধ বা দা'ওয়াত এবং গীবত ও দোষ অনুসন্ধানের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছি। সবশেষে এ ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সুন্নাতে নববী এবং এ বিষয়ক কিছু ভুলভ্রান্তির কথা আলোচনা করেছি।

হাদীসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সহীহ বা নির্ভরযোগ্য হাদীসের ওপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার

মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ধারণ করেছেন, যে নিরীক্ষা-পদ্ধতি বিশ্বের যে কোনো বিচারালয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণের নিরীক্ষার চেয়েও বেশি সূক্ষ্ম ও চুলচেরা। এর ভিত্তিতে যে সকল হাদীস সহীহ বা হাসান অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে আমি আমার আলোচনায় শুধুমাত্র সে হাদীসগুলোই উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি।

অতি নগণ্য এ প্রচেষ্টাটুকু যদি কোনো আগ্রহী মুমিনকে উপকৃত করে তবে তা আমার বড় পাওয়া। কোনো সহৃদয় পাঠক দয়া করে পুস্তিকাটির বিষয়ে সমালোচনা, মতামত, সংশোধনী বা পরামর্শ প্রদান করলে তা লেখকের প্রতি তাঁর ইহসান ও অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে।

মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি দয়া করে এ নগণ্য কর্মটুকু কবুল করে নিন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও পাঠকদের নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন। আমীন!

প্রথম পরিচ্ছেদ : পরিচিতি, গুরুত্ব ও বিষয়বস্তু

১. পরিচিতি: দাওয়াহ, আমর, নাহই, তাবলীগ, নসীহত, ওয়াজ:

নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিজের আশেপাশে অবস্থানরত অন্যান্য মানুষদের মধ্যে আল্লাহর দীনকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। এ জন্য মুমিনের জীবনের একটি বড় দায়িত্ব হলো -আল আমরু বিল মারুফ অয়ান নাহ্ইউ আনিল মুনকার- অর্থাৎ ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। আদেশ ও নিষেধকে একত্রে আদ-দা‘ওয়াতু ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহ্বান বলা হয়। এ ইবাদত পালনকারীকে দা‘ঈ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও সংক্ষেপে দা‘ঈ অর্থাৎ দা‘ওয়াতকারী বা দা‘ওয়াত-কর্মী বলা হয়। দা‘ওয়াত (الدعوة) শব্দের অর্থ, আহ্বান করা বা ডাকা। আরবিতে (الأمر) বলতে আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুনয় সবই বুঝায়। অনুরূপভাবে নাহই (النهي) বলতে নিষেধ, বর্জনের অনুরোধ ইত্যাদি বুঝানো হয়। কুরআন-হাদীসে এই দায়িত্ব বুঝানোর জন্য আরো অনেক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে: তন্মধ্যে রয়েছে আত-তাবলীগ (التبليغ) আন-নাসীহাহ (النصيحة) আল-ওয়াজ (الوعظ) ইত্যাদি। আত-তাবলীগ অর্থ পৌঁছানো, প্রচার করা, খবর দেওয়া, ঘোষণা দেওয়া বা জানিয়ে দেওয়া। আন-নাসীহাহ শব্দের অর্থ আন্তরিক ভালোবাসা ও কল্যাণ কামনা। এ ভালোবাসা ও কল্যাণ কামনা প্রসূত ওয়াজ, উপদেশ বা পরামর্শকেও নসীহত বলা হয়। ওয়াজ বাংলায় প্রচলিত অতি পরিচিত

আরবি শব্দ। এর অর্থ উপদেশ, আবেদন, প্রচার, সতর্কীকরণ ইত্যাদি। দা'ওয়াতের এই দায়িত্ব পালনকে কুরআনুল কারীমে ইকামতে দীন বা দীন প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এগুলো সবই একই ইবাদতের বিভিন্ন নাম এবং একই ইবাদতের বিভিন্ন দিক। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা তা বুঝতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

কুরআন-হাদীসের আলোকে দা‘ওয়াত-এর গুরুত্ব

নবী রাসূলগণের মূল দায়িত্ব,

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, প্রচার, নসীহত, ওয়াজ বা এককথায় আল্লাহর দীন পালনের পথে আহ্বান করাই ছিল সকল নবী ও রাসূলের (আলাইহিমুস সালাম) দায়িত্ব। সকল নবীই তাঁর উম্মতকে তাওহীদ ও ইবাদতের আদেশ করেছেন এবং শির্ক, কুফর ও পাপকাজ থেকে নিষেধ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

“যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবীর, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৭]

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মকে আদেশ ও নিষেধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যত্র এ কর্মকে দা‘ওয়াত বা আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا لَكُمۡ لَا تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدۡعُوكُمۡ لِتُؤۡمِنُواْ بِرَبِّكُمۡ﴾ [الحديد: ٨]

“তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যে, তোমরা তোমাদের রবের ওপর ঈমান আন।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দায়িত্বকে দা‘ওয়াত বা আহ্বান বলে অভিহিত করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]

“আপনি আপনার রবে দিকে আহ্বান করুন হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর ওয়াজ-উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫]

অন্যত্র এই দায়িত্বকেই তাবলীগ বা প্রচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ﴾ [المائدة: ٦٧]

“হে রাসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬৭]

কুরআনুল কারীমে বারবার বলা হয়েছে যে, প্রচার বা পৌঁছানোই রাসূলগণের একমাত্র দায়িত্ব। নিচের আয়াতে বলা হয়েছে:

﴿فَهَلۡ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ﴾ [النحل: ٣٥]

“রাসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৫]

নূহ আলাইহিস সালামের জবানিতে বলা হয়েছে:

﴿أُبَلِّغُكُمۡ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمۡ﴾ [الاعراف: ٦٢]

“আমি আমার রবের রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের নসীহত করছি।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৬২]

সূরা আল-আ‘রাফের ৬৮, ৭৯, ৯৩ নম্বর আয়াত, সূরা হুদ-এর ৩৪ নম্বর আয়াত ও অন্যান্য স্থানে দা‘ওয়াতকে নসীহত বলে অভিহিত করা হয়েছে

সূরা আশ-শুরার ১৩ আয়াতে বলেছেন:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِ﴾ [الشورا: ١٣]

“তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না। আপনি

মুশরিকদের যার প্রতি আহ্বান করছেন তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়।” [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১৩]

তাবারি, ইবন কাসির ও অন্যান্য মুফাসসির, সাহাবী-তাবেঈ মুফাসসিরগণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, **দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো দীন পালন করা।** আর দীন পরিপূর্ণ পালনের মধ্যেই রয়েছে আদেশ, নিষেধ ও দা‘ওয়াত। এ অর্থে কোনো কোনো গবেষক দীন পালন বা **নিজের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যদের জীবনে** দীন প্রতিষ্ঠার দা‘ওয়াতকেও ইকামতে দীন বলে গণ্য করেছেন।

উম্মতে মুহাম্মাদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য:

দা‘ওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা নসীহতের এই দায়িত্বই উম্মতে মুহাম্মাদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤﴾ [ال عمران: ١٠٤]

“আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١١٠﴾ [آل عمران: ١١٠]

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যে আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০]

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

﴿يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١١٤﴾ [آل عمران: ١١٤]

“তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১৪)

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾ [التوبة: ٧١]

“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা

সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১]

সূরা তাওবার ১১২ আয়াতে, সূরা হজের ৪১ আয়াতে, সূরা লুকমানের ১৭ আয়াতে ও অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত মুমিন বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান, সালাত, সাওম ইত্যাদি ইবাদতের মতো সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুমিনের অন্যতম কর্ম। শুধু তাই নয়, মুমিনদের পারস্পারিক বন্ধুত্বের দাবি হলো যে, তারা একে অপরের আন্যায় সমর্থন করেন না, বরং একে অপরকে ন্যায়কর্মে নির্দেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। এখানে আরো লক্ষণীয়, এ সকল আয়াতে ঈমান, সালাত, যাকাত ইত্যাদির আগে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে আমরা মুমিনের জীবনে এর সবিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

এই দায়িত্বপালনকারী মুমিনকেই সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣﴾

[فصلت: ٣٣]

“ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিমদের একজন।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৩]

আমরা দেখেছি যে, আদেশ, নিষেধ বা দা‘ওয়াত-এর আরেক নাম নসীহত। নসীহত বর্তমানে সাধারণভাবে উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হলেও মূল আরবিতে নসীহত অর্থ আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনা। কারো প্রতি আন্তিরকতা ও কল্যাণ কামনার বহিঃপ্রকাশ হলো তাকে ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। এ কাজটি মুমিনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অন্যতম দায়িত্ব, বরং এই কাজটির নামই দীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ قَالَ للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

“দীন হলো নসীহত। সাহাবীগণ বললেন, কার জন্য? বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, মুসলিমগণের নেতৃবর্গের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য।”[1]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নসীহতের জন্য সাহাবীগণের বাই‘আত তথা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন হাদীসে জারির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুগিরা ইবন শু‘বা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবী বলেন,

[1] সহীহ মুসলিম।

«بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلَّمَ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسْلِمٍ»

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাই'আত বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছি, সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান ও প্রত্যেক মুসলিমের নসীহত (কল্যাণ কামনা) করার ওপর।[2]

এ অর্থে তিনি সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের বাই'আত গ্রহণ করতেন। উবাদাহ ইবন সামিত ও অন্যান্য সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন,

«إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ..وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلا نَخَافُ لَوْمَةَ لائِمٍ فِيهِ»

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত করি আনুগত্যের... এবং সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের এবং এ কথার ওপর যে, আমরা মহিমাময় আল্লাহর জন্য কথা বলব এবং সে বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দা বা গালি-গালাজের তোয়াক্কা করব না।"[3]

ক্ষমতা বনাম দায়িত্ব এবং ফরযে আইন বনাম ফরযে কিফায়া

আদেশ নিষেধের জন্য স্বভাবতই ক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রয়োজন। এ জন্য যারা সমাজে ও রাষ্ট্রে দায়িত্ব ও ক্ষমতায় রয়েছেন তাদের জন্য এ দায়িত্ব

[2] সহীহ বুখারী।

[3] আহমাদ, বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য সনদে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফরযে আইন বা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত ফরয। দায়িত্ব ও ক্ষমতা যত বেশি, আদেশ ও নিষেধের দায়িত্বও তত বেশি। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ও তাদের তত বেশি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١﴾ [الحج: ٤١]

"যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে বা ক্ষমতাবান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎকাজে নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে।" [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৪১]

এ জন্য এ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আঞ্চলিক প্রশাসকবর্গ, বিচারকবর্গ, আলিমগণ, বুদ্ধিজীবিবর্গ ও সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে বেশি, তাদের জন্য আশংকা বেশি। তাদের মধ্যে কেউ যদি দায়িত্ব পালন না করে নিশ্চুপ থাকেন তবে তার পরিণতি হবে কঠিন ও ভয়াবহ।

অনুরূপভাবে নিজের পরিবার, নিজের অধীনস্থ মানুষগণ ও নিজের প্রভাবাধীন মানুষদের আদেশ-নিষেধ করা গৃহকর্তা বা কর্মকর্তার জন্য ফরযে আইন। কারণ, আল্লাহ তাকে এদের ওপর ক্ষমতাবান ও দায়িত্বশীল করেছেন এবং তিনি তাকে এদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ألا كُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالامَامُ (الاميرُ) الَّذِي على النَّاس رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وولَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»

"সাবধান! তোমরা সকলেই অভিভাবকত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মানুষদের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসক বা প্রশাসক, অভিভাবক এবং তাকে তার অধীনস্ত জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বাড়ির কর্তাব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ি ও তার সন্তান-সন্ততির দায়িত্বপ্রাপ্তা এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[4]

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্যায় ও অসৎকর্মের প্রতিবাদ করা শুধুমাত্র এদেরই দায়িত্ব। বরং তা সকল মুসলিমের দায়িত্ব। যিনি অন্যায় বা গর্হিত কর্ম দেখবেন তার উপরেই দায়িত্ব হয়ে যাবে সাধ্য ও সুযোগমত তার সংশোধন বা প্রতিকার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ رأي منْكُمْ مُنْكَرًا فلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَانْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَانْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْايْمَانِ»

"তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে প্রতিহত করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে তার

---

[4] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

বক্তব্যের মাধ্যমে (প্রতিবাদ) তা পরিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তা হলে অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন (কামনা) করবে। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।”[5]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুমিনেরই দায়িত্ব হলো, অন্যায় দেখতে পেলে সাধ্য ও সুযোগ মত তার পরিবর্তন বা সংশোধন করা। এ ক্ষেত্রে অন্যায়কে অন্তর থেকে ঘৃণা করা এবং এর অবসান ও প্রতিকার কামনা করা প্রত্যেক মুমিনের ওপরই ফরয। অন্যায়ের প্রতি হৃদয়ের বিরক্তি ও ঘৃণা না থাকা ঈমান হারানোর লক্ষণ। আমরা অগণিত পাপ, কুফর, হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মের সয়লাবের মধ্যে বাস করি। বারংবার দেখতে দেখতে আমাদের মনের বিরক্তি ও আপত্তি কমে যায়। তখন মনে হতে থাকে, এ তো স্বাভাবিক বা এ তো হতেই পারে। পাপকে অন্তর থেকে মেনে নেওয়ার এ অবস্থাই হলো ঈমান হারানোর অবস্থা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিষেধ করেছেন বা যা পাপ ও অন্যায় তাকে ঘৃণা করতে হবে, যদিও তা আমার নিজের দ্বারা সংঘটিত হয় বা বিশ্বের সকল মানুষ তা করেন। এ হলো ঈমানের ন্যূনতম দাবী।

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ক্ষমতার ভিত্তিতে এই ইবাদতটির দায়িত্ব বর্তাবে। এ জন্য ফকীহগণ উল্লেখ

[5] সহীহ মুসলিম।

করেছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠা বা দা‘ওয়াত ও আদেশ নিষেধের এ ইবাদতটি সাধারণভাবে ফরযে কিফায়া।

যদি সমাজের একাধিক মানুষ কোনো অন্যায় বা শরী‘আত বিরোধী কর্মের কথা জানতে পারেন বা দেখতে পান তাহলে তার প্রতিবাদ বা প্রতিকার করা তাদের সকলের ওপর সামষ্টিকভাবে ফরয বা ফরযে কিফায়া। তাদের মধ্য থেকে কোনো একজন যদি এ দায়িত্ব পালন করেন তবে তিনি ইবাদতটি পালনের সাওয়াব পাবেন এবং বাকিদের জন্য তা মূলত নফল ইবাদতে পরিণত হবে। বাকি মানুষেরা তা পালন করলে সাওয়াব পাবেন, তবে পালন না করলে গোনাহগার হবেন না। আর যদি কেউই তা পালন না করেন তাহলে সকলেই পাপী হবেন।

দু’টি কারণে তা ফরযে আইন বা ব্যক্তিগত ফরযে পরিণত হয়:

প্রথমত: ক্ষমতা। যদি কেউ জানতে পারেন যে, তিনিই এ অন্যায়টির প্রতিকার করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে তার জন্য তা ফরযে আইন-এ পরিণত হয়। পরিবারের অভিভাবক, এলাকার বা দেশের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের জন্য এ দায়িত্বটি এ পর্যায়ে ফরযে আইন। এ ছাড়া যে কোনো পরিস্থিতিতে যদি কেউ বুঝতে পারেন যে, তিনি হস্তক্ষেপ করলে বা কথা বললে অন্যায়টি বন্ধ হবে বা ন্যায়টি প্রতিষ্ঠিত হবে তবে তা তার জন্য ফরযে আইন বা ব্যক্তিগতভাবে ফরয হবে।

দ্বিতীয়ত: দেখা। যদি কেউ জানতে পারেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ অন্যায়টি দেখে নি বা জানে নি, তবে তার জন্য তা নিষেধ করা ও

পরিত্যাগের জন্য দা'ওয়াত দেওয়া ফরযে আইন বা ব্যক্তিগত ফরয এ-পরিণত হয়। সর্বাবস্থায় এ প্রতিবাদ, প্রতিকার ও দা'ওয়াত হবে সাধ্যানুযায়ী হাত দিয়ে মুখ দিয়ে বা অন্তর দিয়ে।

আল্লাহর পথে দা'ওয়াত-এর বিষয়বস্তু

দা'ওয়াত, আদেশ, নিষেধ, ওয়াজ, নসীহত ইত্যাদির বিষয়বস্তু কী? আমরা কোন কোন বিষয়ের দা'ওয়াত বা আদেশ-নিষেধ করব? কোন বিষয়ের কতটুকু গুরুত্ব দিতে হবে? আমরা কি শুধুমাত্র সালাত সাওম ইত্যাদি ইবাদতের জন্য দা'ওয়াত প্রদান করব? নাকি চিকিৎসা, ব্যবসা, শিক্ষা, সমাজ, মানবাধিকার, সততা ইত্যাদি বিষয়েও দা'ওয়াত প্রদান করব? আমরা কি শুধু মানুষদের জন্যই দা'ওয়াত প্রদান করব? নাকি আমরা জীব-জানোয়ার, প্রকৃতি ও পরিবেশের কল্যাণেও দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধ করব?

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ঈমান, বিশ্বাস, ইবাদত, মু'আমালাত তথা লেনদেন ইত্যাদি সকল বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। সকল বিষয়ই দা'ওয়াতের বিষয়। কিছু বিষয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কিছু বিষয়ে দা'ওয়াতকে সীমাবদ্ধ করার অধিকার মুমিনকে দেওয়া হয় নি। তবে গুরুত্বগত পার্থক্য রয়েছে। দা'ওয়াতের সংবিধান কুরআনুল কারীম ও হাদীসে যে বিষয়গুলোর প্রতি দা'ওয়াতের বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, মুমিনও সেগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করবেন।

আমরা জানি যে, কুরআন ও হাদীসে প্রদত্ত গুরুত্ব অনুসারে মুমিন জীবনের কর্মগুলোকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ফরযে আইন, ফরযে কিফায়া, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ ইত্যাদি পরিভাষাগুলো আমাদের নিকট পরিচিত। কিন্তু অনেক সময় আমরা ফযীলতের কথা বলতে গিয়ে আবেগ বা অজ্ঞতাবশত: এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল করে থাকি। নফল-মুস্তাহাব কর্মের দা'ওয়াত দিতে গিয়ে ফরয, ওয়াজিব কর্মের কথা ভুলে যাই বা অবহেলা করি। এছাড়া অনেক সময় মুস্তাহাবের ফযীলত বলতে গিয়ে হারামের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বলা হয় না।

কুরআন-হাদীসের দা'ওয়াত পদ্ধতি থেকে আমরা দা'ওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার আদেশ নিষেধের বিষয়াবলীর গুরুত্বের পর্যায় নিম্নরূপ দেখতে পাই:

প্রথমত: তাওহীদ ও রিসালাতের বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন ও সর্ব প্রকার শির্ক, কুফর ও নিফাক থেকে আত্মরক্ষা

সকল নবীরই দা'ওয়াতের বিষয় ছিল প্রথমত: এটি। কুরআন-হাদিসে এ বিষয়ের দা'ওয়াতই সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন তাওহীদের বিধানাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াত দেওয়া হয়েছে, তেমনি বারংবার শির্ক, কুফর ও নিফাকের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে দীনের পথে দা'ওয়াতে ব্যস্ত অধিকাংশ দা'ঈ এই বিষয়টিতে ভয়ানকভাবে অবহেলা করেন। আমরা চিন্তা করি যে, আমরা

তো মুমিনদেরকেই দা‘ওয়াত দিচ্ছি। কাজেই ঈমান-আকিদা বা তাওহিদের বিষয়ে দা‘ওয়াত দেওয়ার বা শির্ক-কুফর থেকে নিষেধ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ١٠٦﴾ [يوسف: ١٠٦]

“তাদের অধিকাংশ আল্লাহর ওপর ঈমান আনায়ন করে, তবে (ইবাদতে) শির্ক করা অবস্থায়।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৬]

হাদীসে মুমিনদেরকে বারংবার শির্ক কুফর থেকে সাবধান করা হয়েছে। শির্ক, কুফর ও নিফাক মুক্ত বিশুদ্ধ তাওহীদ ও রিসালাতের ঈমান ছাড়া সালাত, সাওম, দা‘ওয়াত, জিহাদ, যিকির, তাযকিয়া ইত্যাদি সকল ফরয বা নফল ইবাদতই অর্থহীন।

দ্বিতীয়ত: বান্দার বা সৃষ্টির অধিকার সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন

আমরা জানি ফরয কর্ম দুই প্রকার, করণীয় ফরয ও বর্জনীয় ফরয। যা বর্জন করা ফরয তাকে হারাম বলা হয়। হারাম দুই প্রকার, প্রথম প্রকার হারাম, মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার নষ্ট করা বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলো বর্জন করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান, অধীনস্ত, সহকর্মী, প্রতিবেশী, দরিদ্র, এতিম ও অন্যান্য সকলের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করা, কোনোভাবে কারো অধিকার নষ্ট না করা, কাউকে যুলুম না করা, গীবত না করা, ওজন-পরিমাপ ইত্যাদিতে কম না করা, প্রতিজ্ঞা, চুক্তি, দায়িত্ব বা আমানত আদায়ে আবহেলা না করা, হারাম উপার্জন থেকে আত্মরক্ষা করা,

নিজের বা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বলা ও ন্যায় বিচার করা, কাফির শত্রুদের পক্ষে হলেও ন্যায়ানুগ পন্থায় বিচার-ফয়সালা করা ইত্যাদি বিষয় কুরআন ও হাদীসের দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধের অন্যতম গুরিত্বপূর্ণ বিষয়।

এমনকি রাস্তাঘাট, মজলিস, সমাজ বা পরিবেশে কাউকে কষ্ট দেওয়া এবং কারো অসুবিধা সৃষ্টি করাকেও হাদীসে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সৃষ্টির অধিকার বলতে শুধু মানুষদের অধিকারই বুঝানো হয় নি। পশুপাখির অধিকার সংরক্ষণ, মানুষের প্রয়োজন ছাড়া কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক সময় এ বিষয়গুলো অবহেলিত। এমনকি অনেক দা'ঈ বা দা'ওয়াতকর্মীও এ সকল অপরাধে জড়িত হয়ে পড়েন।

যেকোনো কর্মস্থলে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য কর্মস্থলের দায়িত্ব পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সঠিকভাবে পালন করা ফরযে আইন। যদি কেউ নিজের কর্মস্থলে ফরয সেবা গ্রহণের জন্য আগত ব্যক্তিকে ফরয সেবা প্রদান না করে তাকে পরদিন আসতে বলেন বা একঘন্টা বসিয়ে রেখে চাশতের সালাত আদায় করেন বা দা'ওয়াতে অংশ গ্রহণ করেন তাহলে তিনি মূলত ঐ ব্যক্তির মতো কর্ম করছেন, যে ব্যক্তি পাগড়ির ফযীলতের কথায় মোহিত হয়ে লুঙ্গি খুলে উলঙ্গ হয়ে পাগড়ি পরেছেন।

অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ক আদেশ-নিষেধ কুরআন হাদীসে বেশি থাকলেও আমরা এ সকল বিষয়ে বেশি আগ্রহী নই। কর্মকর্তা, কর্মচারী,

শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্যদেরকে কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন ও আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদানের বিষয়ে দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধ করতে আমরা আগ্রহী নই। অবৈধ পার্কিং করে, রাস্তার ওপর বাজার বসিয়ে, রাস্তা বন্ধ করে মিটিং করে বা অনুরূপ কোনোভাবে মানুষের কষ্ট দেওয়া, অপ্রয়োজনীয় ধোঁয়া, গ্যাস, শব্দ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের বা জীব জানোয়ারের কষ্ট দেওয়া বা প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা, দা'ওয়াত বা আদেশ-নিষেধ করাকে আমরা অনেকেই আল্লাহর পথে দা'ওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করি না। বরং এগুলোকে জাগতিক, দুনিয়াবী বা আধুনিক বলে মনে করি।

তৃতীয়ত: পরিবার ও অধীনস্তদেরকে ইসলাম অনুসারে পরিচালিত করা

বান্দার হক, বা মানবাধিকার বিষয়ক দায়িত্বসমূহের অন্যতম হলো নিজের দায়িত্বাধীনদেরকে দীনের দা'ওয়াত দেওয়া ও দীনের পথে পরিচালিত করা। দা'ওয়াতকর্মী বা দা'ঈ নিজে যেমন এ বিষয়ে সতর্ক হবেন, তেমনি বিষয়টি দা'ওয়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবেন।

চতুর্থত: অন্যান্য হারাম বর্জন করা

হত্যা, মদপান, রক্তপান, শুকরের মাংস ভক্ষণ, ব্যভিচার, মিথ্যা, জুয়া, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, রিয়া ইত্যাদিও হারাম। দা'ঈ বা দা'ওয়াতকর্মী নিজে এসব থেকে নিজের কর্ম ও হৃদয়কে পবিত্র করবেন এবং এগুলো থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য দা'ওয়াত প্রদান করবেন। আমরা দেখতে

পাই যে, কুরাআন ও হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বারংবার বিভিন্নভাবে এ বিষয়ক দা'ওয়াত প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চমত: পালনীয় ফরয-ওয়াজিবগুলো আদায় করা

সালাত, যাকাত, সাওম, হজ, হালাল উপার্জন, ফরযে আইন পর্যায়ের ইলম শিক্ষা ইত্যাদি এ জাতীয় ফরয ইবাদত এবং দা'ওয়াতের অন্যতম বিষয়।

ষষ্ঠত: সৃষ্টির উপকার ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত করা

সকল সৃষ্টিকে তার অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া ফরয। অধিকারের অতিরিক্ত সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য ও উপকার করা কুরআন হাদীসের আলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও প্রিয়তম পথ। ক্ষুধার্তকে আহার দেওয়া, দরিদ্রকে দারিদ্রমুক্ত করা, বিপদগ্রস্তকে বিপদ হতে মুক্ত হতে সাহায্য করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং যে কোনোভাবে যে কোনো মানুষের বা সৃষ্টির কল্যাণ, সেবা বা উপকারে সামান্যতম কর্ম আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। কুরআন ও হাদীসে এ সকল বিষয়ে বারংবার দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধ করা হয়েছে।

সপ্তমত: আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যকার সুন্নাত-নফল ইবাদত করা

নফল সালাত, সাওম, যিকির, তিলাওয়াত, ফরযে কিফায়া বা নফল পর্যায়ের দা'ওয়াত, তাবলিগ, জিহাদ, নসীহত, তাযকিয়া ইত্যাদি এ পর্যায়ের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে রত মুমিনগণ ষষ্ঠ পর্যায়ের নফল

ইবাদতের চেয়ে সপ্তম পর্যায়ের নফল ইবাদতের দা'ওয়াত বেশি প্রদান করেন। বিশেষত, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান তৈরি, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসা সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের দা'ওয়াত প্রদানকে আমরা আল্লাহর পথে দা'ওয়াত বলে মনেই করি না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীব-জানোয়ারও যদি কোনো অন্যায় বা ক্ষতির কর্মে লিপ্ত থাকে সাধ্য ও সুযোগমত তার প্রতিকার করাও আদেশ নিষেধ ও কল্যাণ কামনার অংশ। যেমন কারো পশু বিপদে পড়তে যাচ্ছে বা কারো ফসল নষ্ট করছে দেখতে পেলে মুমিনের দায়িত্ব হলো সুযোগ ও সাধ্যমত তার প্রতিকার করা। তিনি এই কর্মের জন্য আদেশ-নিষেধ ও নসীহতের সাওয়াব লাভ করবেন। পূর্ববর্তী যুগের প্রাজ্ঞ আলিমগণ এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেকেই এ সকল বিষয়কে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার অংশ বলে বুঝতে পারেন না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পুরস্কার ও শাস্তি

দা‘ওয়াতের ফযীলত ও সাওয়াব

সাধারণ সাওয়াব ও বিশেষ সাওয়াব

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, দা‘ওয়াত, দীন প্রচার বা দীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি। আমরা দেখেছি, কাজটি মুমিনের জন্য একটি বড় ইবাদত। এ ইবাদত পালন করলে মুমিন সালাত, সাওম ও অন্যান্য ইবাদত পালনের ন্যায় সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবেন। অবহেলা করলে অনুরূপ ইবাদতে অবহেলার শাস্তি তার প্রাপ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, কুরআন হাদীসে দা‘ওয়াত বা আদেশ নিষেধের এই ইবাদতের জন্য অতিরিক্ত পুরস্কার ও শাস্তির কথা জানানো হয়েছে। পুরস্কারের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষনীয়:

১. সর্বোচ্চ পুরস্কার, ২. অন্যান্য অনেক মানুষের কর্মের সমপরিমাণ সাওয়াব ও ৩. জাগতিক গযব ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া।

সফলতা ও সর্বোচ্চ পুরস্কার

আমরা দেখেছি যে, দা‘ওয়াত ও আদেশ নিষেধের দায়িত্ব পালনকারীরাই সফলকাম বলে কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে। সূরা আন-নিসার ১১৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই দায়িত্ব পালনকারীর জন্য রয়েছে মহা উত্তম পুরস্কার:

﴿لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١١٤﴾ [النساء: ١١٤]

“তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোনো কল্যাণ নেই। তবে (কল্যাণ আছে) যে নির্দেশ দেয় সদকা কিংবা ভালো কাজ অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে তবে অচিরেই আমরা তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করব।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৪]

দা‘ঈর সর্বোচ্চ পুরস্কার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعْمِ»

“আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষকেও আল্লাহ সুপথ দেখান তাহলে তা তোমার জন্য (সর্বোচ্চ সম্পদ) লাল উটের মালিক হওয়ার চেয়েও উত্তম বলে গণ্য হবে।”[6]

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন:

«أَمْرُ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ»

“ভালো কার্যে নির্দেশ করা সদকা বলে গণ্য এবং খারাপ থেকে নিষেধ করা সদকা বলে গণ্য।”[7]

---

[6] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

আমরা যারা সহজে মুখ খুলতে চাই না তাদের একটু চিন্তা করা দরকার। প্রতিদিন অগণিতবার আমরা সুযোগ পাই মুখ দিয়ে মানুষকে একটি ভালো কথা বলার। লোকটি কথা শুনবে কি-না তা বিবেচ্য বিষয়ই নয়। আমি শুধু বলার সুযোগটা ব্যবহার করে সাওয়াব অর্জন করতে পারলেইতো হলো। একটু ভালোবেসে একটি ভালো উপদেশমূলক কথা আমার জন্য আল্লাহর দরবারে অগণিত পুরস্কার জমা করবে। সাথে সাথে লোকটিরও উপকার হতে পারে। যদি হয়, তবে আমরা (নিম্নোক্ত) দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষ পুরস্কার লাভ করব।

অগণিত মানুষের সমপরিমাণ সাওয়াব

দা‘ঈ, মুবাল্লিগ বা দা‘ওয়াত ও তাবলীগে রত ব্যক্তির বিশেষ পুরস্কারের দ্বিতীয় দিক হলো তার এই কর্মের ফলে যত মানুষ ভালো পথে আসবেন সকলের সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব তিনি একা লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ دَعَا إلى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصَّ ذلِكَ مِنْ أُجُرِهِمْ شَيئاً وَمَنْ دَعَا إلى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لايَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئًا».

“যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো পথে আহ্বান করে, তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পুরস্কারের সমপরিমাণ পুরস্কার সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পুরস্কারের কোনো

[7] সহীহ মুসলিম।

ঘাটতি হবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করে তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পাপের কোনো ঘাটতি হবে না।”[8]

মুমিন যদি কোনো একটি ভালো কর্ম করতে সক্ষম নাও হন, কিন্তু তাঁর নির্দেশনা-পরামর্শে কেউ তা করে, তবে তিনি কর্ম সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পান। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»

“যদি কেউ কোনো ভালো কর্মের দিকে নির্দেশনা প্রদান করে তবে তিনি কর্মটি পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবেন।”[9]

আযাব-গযব থেকে রক্ষা

দা‘ওয়াত ও আদেশ নিষেধের দায়িত্ব পলন করার অন্যতম পুরস্কার হলো জাগতিক গযব থেকে রক্ষা পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে তা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন,

«مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْمُدْهِنِ (الواقع) فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيْنَةٍ فِي

[8] সহীহ মুসলিম।

[9] সহীহ মুসলিম।

الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الذيْنَ فِي أَسْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلى الذينَ فِي أَعْلاهَا فَقَالَ الذينَ فِي أَعْلاهَا لا نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤذُوننَا» فَقَالَ الذينَ فِي أَسْفَلِهَا فَإنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا (في نصيبنا) فَنَسْتَقِي (ولم نُؤذ مَنْ فَوقَنَا) فَإنْ أَخَذُوا عَلى أَيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجَوا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكُوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধিবিধান সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট এবং যে লঙ্ঘন করছে উভয়ের উদাহরণ হলো একদল মানুষের মতো। তারা সমুদ্রে একটি জাহাজ বা বজরা ভাড়া করে। লটারির মাধ্যমে কেউ উপরে এবং কেউ নিচের তলায় স্থান পায়। যারা নিচে অবস্থান গ্রহণ করল তাদের পানির জন্য উপরে আসতে হয়। এতে উপরের মানুষদের গায়ে পানি পড়তে লাগল। তখন উপরের মানুষেরা বলল, আমাদেরকে এভাবে কষ্ট দিয়ে তোমাদেরকে উপরে উঠতে দিব না। তখন নিচের মানুষেরা বলল, আমরা আমাদের অংশে বা জাহাজের নিচে একটি গর্ত করি, তাহলে আমরা সহজে পানি নিতে পারব এবং উপরের মানুষদের কষ্ট দিতে হবে না। এই অবস্থায় যদি উপরের মানুষেরা তাদের এ কাজে বাধা দেয় এবং নিষেধ করে তাহলে তারা সকলেই বেঁচে যাবে। আর যদি তারা তাদেরকে এ কাজ করতে সুযোগ দেয় তাহল তারা সকলেই ডুবে মরবে।”[10]

নবুওয়াতের নূর থেকে উৎসারিত এ উদাহরণটি ভালো করে চিন্তা

---

[10] সহীহ বুখারী ও তিরমিযী।

করুন। সমাজের অনেক ক্ষমতাধর বা প্রভাবশালী মানুষ অনেক প্রকারের অন্যায় বা গর্হিত কাজ দেখেও প্রতিবাদ করেন না। তারা জানেন যে, তারা প্রতিবাদ করলে তা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নীরবতা বা তাৎক্ষণিক সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেন। তারা ভাবেন, এতে আমার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কষ্ট করছে অন্য মানুষেরা। নষ্ট হচ্ছে অন্য মানুষের সন্তানেরা। তাদের বুঝা উচিৎ যে, সমাজের এ অবক্ষয় কোনো না কোনোভাবে তাদের ও তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে স্পর্শ করবেই। এ জন্য আমাদের সকলকেই আদেশ-নিষেধের এ দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকতে হবে।

দা‘ওয়াতে অবহেলার শাস্তি

সাধারণ শাস্তি বনাম বিশেষ শাস্তি

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বা এককথায় আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত একটি ফরযে আইন বা ফরযে কিফায়া ইবাদত। সাধারণভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, এ ইবাদত পালনে অবহেলা করলে এ জাতীয় অন্যান্য ইবাদত পালনে অবহেলার ন্যায় গোনাহ হবে। তবে কুরআন হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এ ইবাদত পালনে অবহেলা করার জন্য, বিশেষত, অন্যায় কাজ দেখে সাধ্যমত তার আপত্তি ও সংশোধন না করার জন্য বিশেষ ও কঠিন শাস্তি রয়েছে। শাস্তিগুলো নিম্নরূপ:

দুনিয়াবী গযব

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, যুগে যুগে যারা তাঁদের সমাজের মানুষদেরকে অন্যায় পরিত্যাগ করতে আহ্বান করেছেন, এসব দা‘ঈ ও মুবাল্লিগকে আল্লাহ গযব ও শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আর পাপীরা ও পাপের নীরব সমর্থক পুণ্যবানরা শাস্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। ইয়াহূদীদের জন্য শনিবারে কোনোরূপ কর্ম করা নিষেধ ছিল। শনিবার কোনো জেলে মৎস শিকার করত না। এজন্য নদীতে প্রচূর মাছ দেখা যেত। তাদের মধ্যকার একদল মানুষ হিলা বাহানা করে শনিবারে জাল ফেলে রাখতে শুরু করল, যেন রবিবারে মাছ ধরতে পারে। তখন ভালো মানুষের একদল তাদের নিষেধ করেন

আর একদল বলেন, এসব মানুষের ধ্বংস অনিবার্য, এদের নিষেধ করে কি লাভ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذۡ قَالَتۡ أُمَّةٞ مِّنۡهُمۡ لِمَ تَعِظُونَ قَوۡمًا ٱللَّهُ مُهۡلِكُهُمۡ أَوۡ مُعَذِّبُهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗاۖ قَالُواْ مَعۡذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٦٤ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنجَيۡنَا ٱلَّذِينَ يَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذۡنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِۭ بَـِٔيسِۭ بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ ١٦٥﴾ [الاعراف: ١٦٤، ١٦٥]

“আর স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলল, তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ এমন কওমকে, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন আযাব দেবেন? তারা বলল, তোমাদের রবের নিকট ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আর হয়তো তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল তখন আমরা মুক্তি দিলাম তাদেরকে যারা মন্দ হতে নিষেধ করত। আর যারা যুলুম করেছে তাদেরকে কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারণ তারা পাপাচার করত। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৬৪-১৬৫]

এখানে আমরা দেখছি যে, যারা অন্যায় থেকে নিষেধ করেছেন শুধু তাদেরকেই আল্লাহ গযব-শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

সূরা আল-মায়েদার ৭৮-৭৯ আয়াতে ও সূরা হূদ-এর ১১৬ আয়াতেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।

উপরের আয়াত থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, ওকে বললে কোনো লাভ হবে না, এরূপ ধারণা করে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। কারণ,

প্রথমত: লোকটি কথা শুনবে না একথা নিশ্চিত জানলেও আমাকে বলতে হবে, আমার দায়িত্ব হলো বলা, আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতেই হবে।

দ্বিতীয়ত: লোকটি কথা শুনবে না, একথা এভাবে নিশ্চিত ধারণা করাও ঠিক নয়। কারণ, হয়ত আন্তরিকতাপূর্ণ ভালো কথাটি তার মনে প্রভাব ফেলতে পারে।

দা‘ওয়াতে অবহেলার জাগতিক শাস্তির বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إنَّ النَّاسَ إذَا رأَوا الْمُنْكَرَ لا يُغَيِّرُونَهُ أوشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بعقَابِهِ»

“যখন মানুষেরা অন্যায় দেখেও তা পরিবর্তন বা সংশোধন করবে না তখন যেকোনো মুহূর্তে আল্লাহর শাস্তি তাদের সবাইকে গ্রাস করবে।”[11]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى يَقْدِرُونَ على أنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا إلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أنْ يَمُوتُوا».

[11] তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, সনদ সহীহ।

“কোনো সমাজের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি অবস্থান করে সেখানে অন্যায় পাপে লিপ্ত থাকে এবং সে সমাজের মানুষেরা তার সংশোধন-পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা না করে, তবে তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে।”[12]

দো‘আ কবুল না হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَالذي نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»

“যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই কল্যাণের আদেশ করবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে আল্লাহ অচিরেই তোমাদের সবার ওপর তাঁর গযব ও শাস্তি পাঠাবেন, তারপর তোমরা আল্লাহকে ডাকবে, কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না বা তোমাদের দো‘আ কবুল করা হবে না।”[13]

সামাজিক শান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতি নষ্ট হওয়া

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইসরাঈল সন্তানদের (ইয়াহূদী জাতির) মধ্যে সর্বপ্রথম দুর্বলতা আসলো এভাবে যে, তাদের সমাজের একজন অপরজনকে (অন্যায় কাজে জড়িত) দেখলে বলত, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং যা করেছেন

---

[12] আবু দাউদ, হাদীসটি হাসান।

[13] তিরমিযী, হাসান সূত্রে।

তা পরিত্যাগ করুন, একাজ আপনার জন্য বৈধ নয়। অতঃপর পরদিন তাকে অন্যায়ে লিপ্ত দেখত, কিন্তু (খারাপ লোকটির) অন্যায় তাকে (সৎলোকটিকে) তার সাথে সমাজিক সম্পর্ক রাখতে বাধা দিত না। অন্যায়ে জড়িত থাকা সত্ত্বেও সে তার সাথে একত্রে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া ও সামাজিকতা রক্ষা করে চলত। যখন তারা এরূপ করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাদের সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য নষ্ট করে দেন, তাদের মধ্যে বিভেদ, কলহ ও বৈরিতা সৃষ্টি করে দেন।

একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনুল কারীমের দু'টি আয়াত (সূরা আল-মায়েদার ৭৮-৭৯ আয়াত) তিলাওয়াত করেন: ইসরাঈল সন্তানদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছিল তারা দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল, একারণে যে তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘন করেছিল। তাদের মধ্যে সংঘটিত অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না। তাদের এই আচারণ ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كَلَّا وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ»

“মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎ কর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, অন্যায়কারী বা অত্যাচারীকে হাত ধরে বাধা দান করবে, তাকে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে।

যদি তোমরা তা না কর তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবেন যেমন ইসরাঈল সন্তানদেরকে অভিশপ্ত করেছিলেন।”[14]

পাপ ও অভিশাপ অর্জন

আদেশ-নিষেধের দায়িত্বে অবহেলাকারী নিজে পাপ না করেও অন্যের পাপের কারণে গোনাহ ও লা‘নতের অংশীদার হন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوا»

“অচিরেই তোমাদের ওপর অনেক শাসক-প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না) সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।”[15]

---

[14] আবু দাউদ ও অন্যান্য। সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

[15] সহীহ মুসলিম।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَ قَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»

"যখন পৃথিবীতে কোনো পাপ সংঘটিত হয় তখন পাপের নিকট উপস্থিত থেকেও যদি কেউ তা ঘৃণা করে বা আপত্তি করে তবে সে ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির মত পাপ মুক্ত থাকবে। আর যদি কেউ অনুপস্থিত থেকেও পাপটির বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে বা মেনে নেয় তাহলে সে তাতে উপস্থিত থাকার পাপে পাপী হবে।"[16]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُقْتَلُ فَإِنَّ اللعْنَةَ تَنْزِلُ عَلى مَنْ حَضَرَهُ حِيْنَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ ولا تَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُضْرَبُ مَظْلُومًا فَإِنَّ اللعْنَةَ تَنْزِلُ عَلى مَنْ حَضَرَهُ»

"যেখানে কোনো মানুষকে হত্যা করা হয় সেখানে কখনই দাঁড়াবে না, কারণ সেখানে উপস্থিত লোকেরা যদি তার হত্যা প্রতিরোধ না করে তাহলে সকলের ওপর লা'নত ও অভিশাপ বর্ষিত হয়। আর যেখানে কোনো মানুষকে অত্যাচার করে মারধর করা হয় সেখানে দাঁড়াবে না। কারণ, উপস্থিত সকলের উপরেই লানত-অভিশাপ বর্ষিত হয়।[17]

---

[16] আবু দাউদ। সনদ গ্রহণযোগ্য।

[17] আহমাদ, তাবারানি, বাইহাকী। বাইহাকীর সনদটি হাসান বলে ইরাকি এহইয়াউ উলুমিদ্দীনের তাখরিজে উল্লেখ করেছেন।

অন্য হাদীসে তিনি বলেন,

«لا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالاً ثُمَّ لا يَقُوْلُهُ فَيَقُولُ اللهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ فَيَقُولُ وأَنَا أَحَقُّ أَنْ يُخْشَى»

"তোমাদের কেউ যেন নিজেকে ছোট মনে না করে। সে যদি দেখে যে কোথাও কোনো বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কোনো কথা বলা উচিৎ তখন যেন সে কথা বলা থেকে বিরত না থাকে। তাহলে আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি এ বিষয়ে কেন কথা বলনি? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি মানুষদেরকে ভয় পেয়েছিলাম। তখন তিনি বলবেন, আমার অধিকারই তো বেশি ছিল যে, তুমি আমাকেই বেশি ভয় করবে।"[18]

সমাজের নানাবিধ প্রকাশ্য অন্যায়, যুলুম, গণপিটুনি, বেহায়াপনা, অশ্লীল নাচগান, জুয়া, খুন-খারাবী, মারামারি-দাঙ্গা ইত্যাদির নীরব দর্শক হওয়ার ভয়াবহ পরিণতি আমরা এ হাদীস থেকে বুঝতে পারছি। এ সকল ক্ষেত্রে সাধ্যমত দা'ওয়াত দেওয়ার ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করতে হবে। না হলে দ্রুত এরূপ স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার ও অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করার তাওফিক দান করুন।

[18] আহমাদ, সনদ সহীহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: দা‘ওয়াতের শর্ত ও দা‘ঈর গুণাবলী

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নসীহত, প্রচার, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ এককথায় আল্লাহর পথে দা‘ওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এখন আমাদের দেখতে হবে, এ দায়িত্ব পালনের জন্য শর্তাবলী কি? দা‘ঈ ও মুবাল্লিগ অর্থাৎ দা‘ওয়াতদানকারী ও প্রচারকের মধ্যে কী কী গুণাবলী বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন? কারণ, শরী‘আতসম্মতভাবে দায়িত্ব পালন না করলে আমরা ভালো কাজ করতে গিয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ব। সে দিকটি বিবেচনা করে আমরা দা‘ওয়াতদানকারীর কিছু শর্ত ও গুণাবলী নিম্নে প্রদান করছি:

ইলম বা জ্ঞান

দা‘ওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথম শর্ত হলো, ন্যায়-অন্যায়, তার পর্যায় এবং সেগুলোর প্রতিবাদ-প্রতিকারের ইসলামি পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। আমি যে কাজ করার বা বর্জন করার দা‘ওয়াত দিচ্ছি তা সত্যিই ইসলামের নির্দেশ কিনা তা জানতে হবে। ভালোমন্দ অনেক ক্ষেত্রে সকল মানুষই বিবেক ও জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারেন। খুন, যুলুম, রাহাজানি, চুরি , ডাকাতি, মারামারি, নেশা-মাদকাশক্তি ইত্যাদি অগণিত অন্যায় কাজকে অন্যায় বলে জানতে বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। অনুরূপভাবে মানুষকে সাহায্য করা, সান্ত্বনা দেওয়া, সৃষ্টির কল্যাণে এগিয়ে আসা ইত্যাদি ভালো কাজ বলে সবাই বুঝি। কিন্তু ইসলামি কর্মকাণ্ড বা ধর্মীয় নির্দেশনা বিষয়ক অগণিত বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে নিজেই অন্যায়ে

লিপ্ত হবেন। অথবা সৎকাজে আদেশ দান করতে গিয়ে অসৎকাজে আদেশ করবেন। যেমন, এক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কাজ করছেন বা স্ত্রী-সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য জরুরি কাজ করছেন। কাজটি তার জন্য ফরযে আইন। আপনি তাকে এই দুনিয়াবী কাজ বর্জন করে নফল বা ফরযে কিফায়া পর্যায়ের মাহফিল, মিছিল, মিটিং বা দা'ওয়াতে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। অথবা এক ব্যক্তি ওজরের কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করছেন দেখে আপনি তাকে যাচ্ছেতাই গালি-গালাজ করলেন। উভয় ক্ষেত্রে আপনি ন্যায় করতে গিয়ে অন্যায়ে লিপ্ত হলেন। এরূপ অগণিত উদাহরণ আমরা দেখতে পাব। এজন্য ধর্মীয় বিধি-বিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে মুমিনের উচিৎ বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বা অন্যায় তা স্পষ্টভাবে না জেনে হটকারিতায় লিপ্ত না হওয়া। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট জ্ঞানের অত্যাবশ্যকতা বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ﴾ [يوسف: ١٠٨]

"বল, এটিই আমার পথ। সুস্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি আমি এবং আমার যারা অনুসারী।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৮]

এ সুস্পষ্ট জ্ঞান হলো, ওহী নির্ভর জ্ঞান বা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلۡوَحۡيِۚ وَلَا يَسۡمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٤٥﴾ [الانبياء: ٤٥]

“বল আমি তো শুধু ওহীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৪৫]

সূরা আহকাফের ৯ নম্বর আয়াত ও অন্যান্য স্থানে একই কথা বলা হয়েছে। এজন্য দা‘ওয়াতের দায়িত্ব পালনকারীকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্পষ্টরূপে জানতে হবে, যে কাজ করতে বা বর্জন করতে তিনি দা‘ওয়াত দিচ্ছেন তার শর‘ঈ বিধান কি এবং তা পালন-বর্জনের দা‘ওয়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো পদ্ধতি কী? কাজটি সৎকর্ম হলে তা ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব ইত্যাদি কোন পর্যায়ের তা স্পষ্ট কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানতে হবে। ওহীর স্পষ্ট নির্দেশনা ব্যতীত সাধারণ ধারণা, আবেগ আন্দাজ ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম বলতে কুরআনুল কারীমে নিষেধ করা হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ١١٦﴾ [النحل: ١١٦]

“তোমাদের জিহ্বা দ্বারা মিথ্যা আরোপ করে (মনগড়াভাবে) বলবে না যে, এটি হালাল ও এটি হারাম। এভাবে আল্লাহর নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করা হবে। যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তারা সফল হয় না।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১১৬]

দা‘ঈ ও মুবাল্লিগকে অবশ্যই সর্বদা বেশি বেশি কুরআন ও হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ও অন্যান্য ইসলামি গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে। কুরআন-হাদীস বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আলিমদের রচিত গ্রন্থাদি পড়ে দীনকে

জানার চেষ্টা করা কঠিন অন্যায় এবং কুরআন হাদীসের প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন। মহান আল্লাহ কুরআনকে সকল মানুষের হিদায়াতরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি তা বুঝা সহজ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য তাঁর মহান সুন্নাত ও হাদীস রেখে গেছেন। এগুলোর সার্বক্ষণিক অধ্যায়ন মুমিনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, শ্রেষ্ঠতম যিকির ও দা‘ওয়াতের প্রধান হাতিয়ার।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা

আদেশ-নিষেধ, নসীহত, বা আল্লাহর পথে আহ্বান করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, যাকে আদেশ করছি বা আহ্বান করছি তার প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসা ও আন্তরিক মঙ্গল কামনা। এ জন্যই দা‘ওয়াতের এ কর্মকে কুরআন ও হাদীসে নসীহত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখছি যে, নসীহতের মূল অর্থ **“আন্তরিক ভালোবাসা ও মঙ্গল কামনা”**। আল্লাহর পথে আহ্বানকারী বা আদেশ নিষেধকারী কারো ভুল ধরে দেওয়া, নিজের জ্ঞান প্রদর্শন বা নিজের মাতব্বরি প্রতিষ্ঠার জন্য এই কাজ করবেন না; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসার টানেই এ দায়িত্ব পালন করবেন।

অন্যায়ে লিপ্ত বা বিভ্রান্ত যে ব্যক্তিকে তিনি দা‘ওয়াত দিচ্ছেন তার প্রতি তার হৃদয়ের অনুভূতি হবে বিপদগ্রস্ত আপনজনের মতো। যার বিপদে তিনি ব্যাথা অনুভব করছেন এবং যাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য হৃদয়ের আকুতি অনুভব করছেন। তাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিলে যদি সে তা না মানে বা বিরোধিতা করে তবে আহ্বানকারী মুমিনের

হৃদয়ে ক্রোধ বা প্রতিহিংসা জাগ্রত হবে না, বরং বেদনা ও দুশ্চিন্তা তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করবে। বেদনায় তার হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে উঠবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অবস্থার কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন:

﴿فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا ۝٦﴾ [الكهف: ٦]

"তারা এই বাণীতে ঈমান না আনলে সম্ভবত আপনি তাদের পিছনে ঘুরে দুঃখ-বেদনায় নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন।" [সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ৬]

সূরা আশ-শু'আরা-এর ৩ নং আয়াতেও অনুরূপ বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনে এই ভালোবাসা ও প্রেমের অগণিত উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। যে কাফিরগণ তাঁর দেহকে রক্তরঞ্জিত করছে তাদেরই জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করছেন। তিনি তাঁর কপালের রক্ত মুছছেন আর বলছেন,

«رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ»

"হে আমার রব, আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না।"[19]

মক্কাবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে গিয়ে পেলেন নির্মমতম অত্যাচার। সে সময়ে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম পাহাড়ের ফিরিশতাকে নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করে বললেন, আপনার অনুমতি হলে পাহাড় উঠিয়ে এ জনপদকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কঠিনতম কষ্টের সে মুহূর্তেও তিনি বললেন:

«بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا»

"না বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ হয়ত এদের ঔরস থেকে এমন মানুষের জন্ম দেবেন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কিছু শরিক করবে না।"[20]

সুবহানাল্লাহ! কত বড় ধৈর্য! কত মহান ভালোবাসা!! আমরা যারা সামান্য বিরোধিতায় উত্তেজিত হয়ে গালাগালি করি ও প্রতিশোধের পরিকল্পনায় বিভোর হই তাদের একটু চিন্তা করা দরকার!

ব্যক্তিগত আমল

দা'ঈ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও আদেশ-নিষেধকারী অবশ্যই তাঁর প্রচারিত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, বিশ্বাসী ও পালনকারী

---

[19] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, ফতহুল বারী।

[20] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

হবেন। সারা বিশ্বে যিনি আল্লাহর দীন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা দেখতে চান, তাকে সবার আগে তার ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল দিকে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট আদর্শ নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠার চেয়ে অন্যকে দা'ওয়াত দেওয়া আনেক বেশি সহজ ও আকার্ষণীয় কাজ। এজন্য শয়তান এবং মানবীয় প্রবৃত্তির কাছে তা খুবই প্রিয়। এর শাস্তিও খুব কঠিন।

ইয়াহূদীরা সর্বদা ধর্ম ও মানবতার বিষয়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় আদর্শের বুলি আউড়ায় কিন্তু নিজেরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٤٤﴾

[البقرة: ٤٤]

“তোমরা কি মানুষদেরকে সৎকাজে নির্দেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর! তবে কি তোমরা বুঝ না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৪]

দীনের দা'ওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কাজে লিপ্ত অনেকেই বুঝে অথবা না বুঝে এ অপরাধে অপরাধী। ইসলামের দা'ওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কথা বললেও ব্যক্তিগত ইবাদত, আচরণ, পারিবারিক সম্পর্ক, স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, কর্মস্থল, সহকর্মী ও অন্যান্য মানুষের অধিকার আদায় ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত দুর্বল। এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। দুই পর্যায়ে আমরা এ অপরাধে লিপ্ত হই:

প্রথমত: যে কার্যের জন্য আদেশ বা নিষেধ করছি তা আমরা নিজেরাই তা পালন বা বর্জন করছি না। যেমন আমরা প্রতিবেশীর অধিকার পালন অথবা সুদ বর্জনের দা'ওয়াত দিচ্ছি, কিন্তু নিজেরাই প্রতিবেশীর অধিকার নষ্ট করছি বা সুদে লিপ্ত রয়েছি।

দ্বিতীয়ত: আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাধী না হলেও, অন্যান্য সমপর্যায়ের অপরাধে লিপ্ত রয়েছি। যেমন আমরা সুদ খাচ্ছি না, তবে ঘুষ, যৌতুক, কর্মে ফাঁকি, ভেজাল ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত আছি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝٢ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝٣﴾ [الصف: ٢، ٣]

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক যে, তোমরা যা কর না তা বলবে।" [সূরা আস-সফ, আয়াত: ২-৩]

সূরা আল-বাকারার ২০৪ আয়াত ও সূরা আল-মুনাফিকুন-এর ৪ আয়াতেও আমরা কথা ও কর্মের বৈপরিত্যের কঠিন নিন্দা দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَومَ القِيَامَةِ فَيُلْقَي فِي النّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أي فُلانٌ مَا شأنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تأمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ولا آتِيْهِ وَأنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ آتِيْهِ»

“কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনায়ন করে জাহান্নামের অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন যাতা (ঘানি) নিয়ে ঘুরে তেমনি সে ঘুরতে থাকবে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট সমবেত হয়ে বলবে, হে অমুক, তোমার কি হলো? তুমি না আমাদেরকে সৎকাজে আদেশ দিতে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে? সে বলবে আমি তোমাদেরকে সৎকাজে আদেশ দিতাম কিন্তু নিজে করতাম না। আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম।”[21]

আমরা মহান আল্লাহর নিকট এমন করুন পরিণতি থেকে আশ্রয় চাই।

ব্যক্তিগত আমলে ত্রুটিসহ দা‘ওয়াতের বিধান

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝতে পারছি যে, নিজে পালন না করে অন্যকে দা‘ওয়াত দেওয়া অন্যায়। তবে দা‘ওয়াত বা আদেশ নিষেধ ফরযে আইন পর্যায়ের হলে নিজের আমলে ত্রুটি থাকলেও আদেশ নিষেধ করতে হবে। যেমন, এক ব্যক্তি ধুমপান করেন বা ঠিকমত জামা‘আতে সালাত পড়েন না। তিনি তার অধিনস্ত বা পরিবারের সদস্য কাউকে এ পাপে লিপ্ত দেখলে তার জন্য তাকে আদেশ বা নিষেধ করা ফরযে আইন দায়িত্ব হয়ে যাবে। এ অবস্থায় আদেশ নিষেধ না করলে তিনি দ্বিতীয় একটি অন্যায় ও অপরাধের মধ্যে পতিত হবেন।

[21] সহীহ বুখারী।

বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা

দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা। আমরা অনেক সময় সৎকাজে আদেশ বা অন্যায় থেকে নিষেধ করাকে ব্যক্তিগত অহং প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে নিয়ে যাই। ফলে আমরা কথা বলি মাতব্বরি ভঙ্গিতে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের অহংবোধে আঘাত করে এবং আমাদের কথা গ্রহণ করতে বাধা দেয়। এরপর যখন সে তা গ্রহণ না করে বা আমাদের বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলে তখন আমরা তাকে ইসলামের শত্রু আখ্যায়িত করে কঠিনভাবে তার বিরুদ্ধে আক্রোশমূলক কথা বলি। এগুলো সবই কঠিন অন্যায় এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার পথ। আমরা অনেক সময় গরম কথা বা কড়া কথা বলাকে সাহসিকতা ও জিহাদ বলে মনে করি। অথচ আল্লাহ কুরআনুল কারীমে নরম কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ হক কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু গরম কথা বলতে কখনও নির্দেশ দেন নি। হক্ক কথাকে নরম করে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বের অন্যতম তাগুত আল্লাহদ্রোহী যালিম ফির‘আউনের কাছে মূসা ও হারূন আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করে তিনি নরম কথার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿ٱذۡهَبَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ۝٤٣ فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ ۝٤٤﴾

[طه: ٤٣، ٤٤]

“তোমরা উভয়ে ফির‘আউনের নিকট গমন কর, সে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।” [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৪৩-৪৪]

এ যদি হয় কাফিরকে দা‘ওয়াত দেওয়ার বা আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের প্রতি নির্দেশ, তাহলে যারা কালেমা পড়েছেন তাদেরকে আদেশ নিষেধ করার ক্ষেত্রে আমাদের আরো কত বিনম্র ও বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিৎ তা একটু চিন্তা করুন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٍۗ﴾ [الانعام: ١٠٨]

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিবে না কারণ ফলে তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১০৮]

এ যদি হয় কাফিরদের দেবদেবীর ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ, তাহলে কালেমা পাঠকারী মুসলিম বলে পরিচিত ব্যক্তিকে আদেশ নিষেধ করতে গিয়ে তাকে তার ভ্রান্ত বা জাগতিক মতের নেতা বা সাথীদেরেক গালি দেওয়া কীভাবে বৈধ হবে? গালাগালি, কঠোরতা, হিংসা, ঘৃণা, গীবত, অহংকার ইত্যাদি দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাতে মূলত নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে, কোনো ইবাদত পালন করা হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

সম্মানিত পাঠক, দা'ওয়াত বা সৎকাজের নির্দেশনা ও অসৎকাজের নিষেধ-এর উদ্দেশ্য মানুষের ওপর মাতব্বরি করা বা মানুষের ভুল ধরা নয়। বরং মানুষদেরকে সৎপথে আহ্বান করা এবং যথাসম্ভব মানুষকে ভালো পথে আসতে সাহায্য করা। এজন্য সর্বোচ্চ বিনম্রতা, ভদ্রতা ও ধৈর্য প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় দা'ঈ ও আদেশ নিষেধকারী ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তার অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল বিনম্রতা। বিনম্রতা ও ধৈর্যের অনুপম আদর্শ দিয়ে তিনি জয় করেছিলেন অগণিত বেদুঈন আরবের কঠিন হৃদয়। অস্ত্র বা শক্তি দিয়ে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন নি। অনুপম চরিত্র ও ভালোবাসাময় আদেশ নিষেধ বা দা'ওয়াত দিয়ে হৃদয়গুলোকে জয় করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মদিনার রাষ্ট্র। এরপর সে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা করেছেন যুদ্ধের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ হৃদয় জয়ের এ কাহিনী বিধৃত করে বলেছেন,

﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَ﴾

[ال عمران: ١٥٩]

"আল্লাহর দয়ার অন্যতম প্রকাশ যে আপনি তাদের প্রতি বিনম্র-কোমল হৃদয় ছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯]

একটি হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

«أَنَّ يَهُودَ أَتَوا النَّبِيَّ صلي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُم (السَّام)وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَ غَضِب اللهُ عَلَيْكُم قَالَ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ) وإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ والْفُحْشَ قَالَتْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ (أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ) قَد قُلْتُ وَعَلَيْكُم»

“কতিপয় ইয়াহূদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আস-সামু আলাইকুম (আপনার ওপর মরণ অভিশাপ) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমাদের ওপর মরণ, তোমাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করুন এবং তোমাদের ওপর তার ক্রোধ অবতীর্ণ হোক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আয়েশা শান্ত হও। তুমি অবশ্যই সর্বদা বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ সকল বিষয়ে বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা ভালোবাসেন। আর খবরদার! কখনই তুমি উগ্রতা ও অভদ্রতার নিকটবর্তী হবে না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তারা কী বলেছে আপনি কি তা শুনেননি? তিনি বলেন, আমি কি বলেছি তা কি তুমি শোন নি? আমি বলেছি, ওয়ালাইকুম অর্থাৎ তোমাদের উপরে।[22]

উত্তম দিয়ে মন্দ প্রতিহত করা

দা‘ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্য, ক্ষমা ও উত্তম ব্যবহারের দ্বারা খারাপ আচরণের প্রতিরোধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। আল্লাহ বলেন,

---

[22] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣ وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ ٣٤ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ ٣٥﴾ [فصلت: ٣٣، ٣٥]

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভালো এবং মন্দ সমান হতে পারে না। (মন্দ) প্রতিহত কর উৎকৃষ্টতর (আচরণ) দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এগুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহা সৌভাগ্যবান।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৩-৩৫]

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةَۚ نَحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٦﴾ [المؤمنون: ٩٦]

"মন্দের মুকাবিলা কর যা উৎকৃষ্টতর তা দিয়ে, তারা যা বলে আমরা সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৯৬]

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে গালির পরিবর্তে গালি, নিন্দার প্রতিবাদে নিন্দা, রাগের প্রতিবাদে রাগ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এসব মন্দ আচরণের প্রতিরোধ করতে হবে উৎকৃষ্টতর আচরণ দিয়ে, অথচ আমরা অনেক সময় এই নির্দেশের বিপরীত কর্ম করি। কেউ প্রতিবাদ করলে বা খারাপ আচরণ করলে আমরা তার

আচরণের চেয়ে নিকৃষ্টতর আচরণের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করি!!

সুন্দর ব্যবহার ও আচরণ

দা‘ঈ বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধকারীকে অবশ্যই তাঁর নেতা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত মহোত্তম আচরণের অধিকারী হতে হবে। আরবিতে একে (خلق) বা আখলাক বলা হয়। বাংলায় সাধারণত একে চরিত্র বলা হয়। আর আরবিতে আখলাক শব্দ আরো প্রশস্ত। মানুষের সাথে মানুষের আচরণ ও ব্যবহারের সামগ্রিক অবস্থাকেই আরবিতে খুলুক বলা হয়। এজন্য খুলুক বা আখলাককে বাংলায় আচরণ বা ব্যবহার বলাই উত্তম।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤﴾ [القلم: ٤]

“আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্র ও ব্যবহারের ওপর অধিষ্ঠিত।” [সূরা আল-কলম, আয়াত: ৪]

এ মহান আচরণের বিভিন্ন দিক রয়েছে। উল্লিখিত বিনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, উৎকৃষ্ট চরিত্র দিয়ে মন্দ প্রতিহত করা ইত্যাদিও এই খুলুকে আযীম বা মহান আচরণের অংশ। তবে এর আরো বিভিন্ন দিক রয়েছে যা দা‘ঈ ইলাল্লাহকে অর্জন করতে হবে। শুধু দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ ব্যবহার বা আচরণ আল্লাহর

পথে আহ্বানকারীর জীবনকে আলোকিত করবে এবং তার চারিধারে ফুলের সৌরভ ছড়াবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আচরণের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচনা করতে পৃথক গ্রন্থ প্রয়োজন। এখানে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা যায়:

১. সর্বাবস্থায় অশ্লীল কথা, অশালীন কথা, গালিগালাজ ও কটুক্তি বর্জন করা। বিভিন্ন হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে,

«لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا ولا مُتَفَحِّشًا ولا لَعَّانًا ولا سَبَّابًا»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশালীন, অশ্লীল, অশোভনীয় কথা বলতেন না, গালি দিতেন না, কটুক্তি করতেন না।"[23]

২. বেশি কথা বলা, দম্ভভরে বা চিবিয়ে কথা বলা, অহঙ্কার করা, বিতর্ক করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি পরিহার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يومَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلاقًا وإنَّ أَبْغَضَكُمْ إلَيَّ وأَبْعَدَكُمْ مِنَي مَجْلِسًا يومَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ والْمُتَشَدَّقُونَ والْمُتَفَيْهِقُونَ»

"তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থানের অধিকারী হবে তারা যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আচরণের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে আমার

---

[23] সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।

নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে তারা যারা বেশি কথা বলে, যারা কথা বলে জিতে যেতে চায়, বাজে কথা বলে এবং যারা অহঙ্কার করে।”[24]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمَراءَ وإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلي الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقُهُ».

“নিজের মতটি হক হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করল আমি তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে একটি বাড়ির জিম্মাদারী গ্রহণ করলাম। আর যে ব্যক্তি হাসি-মশকারার জন্যও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বাড়ির জিম্মাদারী গ্রহণ করলাম। আর যার আচরণ-ব্যবহার সুন্দর আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি বাড়ির জিম্মাদারী গ্রহণ করলাম।”[25]

৩. সকলের সাথে আনন্দিত চিত্তে, হাসিমুখে কথা বলা এবং কথার সময় পরিপূর্ণ মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে তার কথা শোনা। যেন তার প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা পূর্ণভাবে ফুটে উঠে। ‘আমর ইবনল ‘আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيْثِهِ عَلي شَرِّ الْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُ بِذلِكَ وَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيْثِهِ عَلَيَّ حتَّي ظَنَنتُ أَنِّي خَيْرُ الْقَوْمِ»

---

[24] তিরমিযী, হাদীসটি হাসান।

[25] আবু দাউদ, হাসান, সহীহুল জামে।

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সাথেও পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার দিকে পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে কথা বলতেন। এভাবে তিনি তার হৃদয় জয় করে নিতেন। তিনি আমার সাথেও কথা বলতেন পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এবং আমার দিকে পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে। এমনকি আমার মনে হতো যেন আমিই সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ।”[26]

এখানে উল্লেখ্য যে, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ এবং অহংকারহীন হৃদয় না হলে এগুণ পুরোপুরি অর্জন করা যায় না।

উত্তম আচরণ শুধু দা‘ওয়াতের সফলতার চাবিকাঠিই নয়, উপরন্তু আখেরাতের সফলতার সর্বোত্তম উপায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيْزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لِيَبْلُغَ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّومِ والصَّلاةِ».

“কিয়ামতের দাড়িপাল্লায় উত্তম আচরণের চেয়ে বেশি ভারি কোনো আমল আর রাখা হবে না। আর উত্তম আচরণের অধিকারী ব্যক্তি এ আচরণের দ্বারাই তাহাজ্জুদ ও নফল রোযা পালনকারীর মর্যাদা অর্জন করবে।”[27]

সবর বা ধৈর্য

---

[26] তাবরানি, হাসান।

[27] তিরমিযী, আহমদ, আবু দাউদ, হাদীসের সূত্র সহীহ, সহীহুল জামে।

উপর্যুক্ত গুণগুলো অর্জন করতে ধৈর্যের অনুশীলন করতে হবে। পূর্বোল্লিখিত একটি আয়াতে আমরা দেখেছি যে, উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করার গুণ শুধু ধৈর্যশীলগণই অর্জন করতে পারেন এবং তারাই মহা সৌভাগ্যবান। দা'ওয়াত ও ধৈর্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ﴾ [لقمان: ١٧]

"সালাত কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার ওপর যা নিপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এগুলোই দৃঢ়সংকল্পের কাজ।" [সূরা লুকমান, আয়াত: ১৭]

সূরা আলে ইমরানের ১৮৬ আয়াত এবং সূরা আল-আসরেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধৈর্যের মূল পরিচয় হলো রাগের সময়। আল্লাহর পথে ডাকতে বা ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ করতে গেলেই অনেক মানুষের নিকট থেকে বিরূপ কথা, গালমন্দ, নিন্দা ইত্যাদি শুনতে হবে এবং এতে কখনো প্রচণ্ড রাগ হবে এবং কখনো মন দুঃখ-ভরাক্রান্ত হবে। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদেরকে ধৈর্যের মাধ্যমে এর মুকাবিলা করতে হবে এবং উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করতে হবে। কুরআনুল কারীমে বারংবার মুমিনদেরকে ধৈর্য অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্রোধ সংবরণ করাকে মুমিনদের মৌলিক পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর

পথে টিকে থাকার জন্য ধৈর্য ও সালাতের সাহায্য গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কাফিরদের নিন্দামন্দ, মিথ্যা-অপবাদ, বিরূপ কথা ও ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়ে সূরা আন-নাহলের ১২৭-১২৮ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱصۡبِرۡ وَمَا صَبۡرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَلَا تَكُ فِي ضَيۡقٖ مِّمَّا يَمۡكُرُونَ ١٢٧ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ١٢٨﴾ [النحل: ١٢٧، ١٢٨]

"ধৈর্য ধারণ কর, আর তোমার ধৈর্য তো আল্লাহর সাহায্য ছাড়া হবে না। আর তাদের দরুন দুঃখ করবে না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হবে না। আল্লাহ (জ্ঞান, দেখা ও সহযোগিতায়) তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করেন এবং যারা সৎকর্ম পরায়ণ।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৭-১২৮]

সালাত, তাসবীহ ও ইবাদত

ধৈর্য অর্জনের অত্যন্ত বড় অবলম্বন হলো সালাত ও দো'আ। কুরআনুল কারীমে একাধিক স্থানে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে শক্তি অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা হিজর-এর ৯৭-৯৯ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدۡرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ٩٧ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ٩٨ وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ ٩٩﴾ [الحجر: ٩٧، ٩٩]

“আমি তো জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তোমার রবের তাসবিহ-তাহমিদ বা প্রশংসাময় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং একিন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত কর।” [সূরা আর-হিজর, আয়াত: ৯৭-৯৯]

আল্লাহর পথে ডাকতে গেলে বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে গেলে মানুষের বিরোধিতা, শত্রুতা ও নিন্দার কারণে কখনো ক্রোধে, কখনো বা বেদনায় অন্তর সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। এ মনোকষ্ট দূর করার প্রকৃত ধৈর্য ও মানুষিক স্থিতি অর্জন করার উপায় হলো বেশি বেশি আল্লাহর যিকির, ক্রন্দন ও প্রার্থনা করা। এভাবেই আমরা (Re-active) না হয়ে (Pro-active) হতে পারব। কারো আচরণের প্রতিক্রিয়া আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করবে না। আল্লাহর রেজামন্দির দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আচরণ করতে পারব। আমরা সত্যিকার অর্থে মহা- সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি

বিভিন্ন অজুহাতে এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা

অনেক সময় আমরা বিভিন্ন অজুহাতে দা‘ওয়াতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে থাকি। কখনো মনে করি, বলে আর কি হবে, ওরা তো শুনবে না। কখনো ভাবি, আখেরি জামানা, এখন আর বলে লাভ নেই। এ সকল চিন্তা শয়তানি ওয়াসওয়াসা ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরের আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বললে শুনবে না এ কারণে বলা থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। মুমিনের দায়িত্ব শুনানো বা পালন করানো নয়, মুমিনের দায়িত্ব কেবল বলা ও প্রচার করা।

উপরের আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কোন যুগ সর্বশেষ তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। হক্ক ও বাতিলের সংঘাত কিয়ামত পর্যন্তই চলবে। বাতিলের প্রাধান্য দেখে বিচলিত হয়ে বালিতে মুখ গোঁজার অনুমতি মুমিনকে দেওয়া হয় নি। নির্দিষ্ট কোনো সময়ে আদেশ-নিষেধ ও দা‘ওয়াতের এই দায়িত্ব রহিত হবে বলে জানানো হয় নি। সকল যুগেই সাধ্যমত সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা মুমিনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব। শুধু একটি ক্ষেত্রে মুমিনের জন্য আদেশ, নিষেধ বা দা‘ওয়াতের দায়িত্ব পালন ফরয হবে না বলে আলিমগণ উল্লেখ করেছেন। তা হলো, নিশ্চিত ক্ষতি বা যুলুমের ভয়।

সূরা আল-বাকারাহ-এর ১৯৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]

"এবং তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لا يَنْبَغِي للمؤْمِنِ أنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاءِ لِمَا لا يُطِيقُ»

"মুমিনের উচিৎ নয় নিজেকে অপমানিত করা। সাহাবীগণ বলেন, কীভাবে সে নিজেকে অপমানিত করবে? তিনি বলেন, নিজেকে এমন বিপদের মুখে ফেলবে যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।"[28]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে থাক। অবশেষে যখন দেখবে যে, সর্বত্র মানুষ জাগতিক লোভলালসার দাস হয়ে গিয়েছে, প্রত্যেকেই নিজ প্রবৃত্তির মর্জি মাফিক চলছে, দুনিয়াবি স্বার্থ সর্বত্র প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকেই তার নিজের মতকে সর্বোত্তম বলে বিশ্বাস করছে, তখন তুমি নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হবে এবং সাধারণ মানুষের বিষয় ছেড়ে দেবে। কারণ, তোমাদের সামনে রয়েছে এমন কঠিন সময়, যখন ধৈর্য্য ধারণ করাও আগুনের অঙ্গার মুঠি করে ধরার

[28] তিরমিযী, ইবন মাজাহ, আবু ইয়া'লা, তাবরানী। সহীহ, মাজমাউল ফাওয়াইদ ৭/২৭২-২৭৫।

মত কষ্টদায়ক হবে। সে সময় যারা কর্ম করবে তারা তোমাদের মত যারা কর্ম করে তাদের ৫০ জনের সমান পুরস্কার লাভ করবে। সাহাবীগণ বলেন, না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সাওয়াব না তাদের মধ্যকার? তিনি বলেন, না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সাওয়াব।[29]

উপরের আয়াত ও হাদীসগুলোর আলোকে আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, মুমিন যদি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে, আদেশ-নিষেধ বা দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে গেলে যুলুম বা অপমানের শিকার হতে হবে অথবা গৃহযুদ্ধ, পরস্পর হানাহানি ও চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তার কথা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটাবে, তবে তিনি তা পরিত্যাগ করতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে চারটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে:

প্রথমত. উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, মানুষের ভয়ে হক কথা বলা পরিত্যাগ করলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এজন্য সামান্য ভয় বা অনিশ্চিত আশঙ্কার কারণে এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত. যদি মুমিন ক্ষতি বা অপমান সম্পর্কে নিশ্চিত হন তাহলে তাকে অবশ্যই সে স্থান পরিত্যাগ করা উচিৎ। আমরা উপরে কয়েকটি হাদীসে দেখেছি যে, যেখানে অন্যায় সংঘটিত হয় সেখানে বাধা দেওয়ার

---

[29] তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, ইবন হিব্বান, হাকিম। সহীহ।

ক্ষমতা না থাকলে মুমিনের দায়িত্ব হলো অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করা, নইলে তাকেও অভিশাপ ও গযবের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

তৃতীয়ত. সম্ভব হলে, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও সমস্যার মধ্যেও সাধ্যমত এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ এ পরিস্থিতিতে ভীতি ও ক্ষতির মধ্যেও যারা ধৈর্য্য ধারণ করে সাহাবীদের মত দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধের কাজ করতে পারবেন তাঁদের একজন ৫০জন সাহাবীর সমান সাওয়াব ও পুরস্কার পাবেন।

চতুর্থত. সর্বাবস্থায় অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ও অন্যায় অপসারণের জন্য হৃদয়ের আকুতি মুমিনের জন্য ফরযে আইন। অন্যায়কে মেনে নওয়া, এমন তো হতেই পারে, বা ওদের কাজ ওরা করছে আমি কি করব, ইত্যাদি চিন্তা করে নির্বিকার থাকা বা অন্যায়ের প্রতি মনোকষ্ট অনুভব না করা ঈমান হারানোর লক্ষণ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার অবমাননা যে মুমিনকে পীড়া না দেয় তার ঈমানের দাবী অসার।

কঠোরতা, উগ্রতা বা সীমালঙ্ঘন

আমরা দেখেছি যে, দা'ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কঠোরতা বা উগ্রতা নিষিদ্ধ। মহান প্রভু যিনি মুমিনের ওপর দা'ওয়াতের দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তিনিই তাকে এ ক্ষেত্রে নম্রতার নির্দেশ দিয়েছেন। সালাতের জন্য তিনি পবিত্রতার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই পবিত্রতা ছাড়া সালাত আদায় করলে তাতে আল্লাহর ইবাদত হবে না, মনগড়া কাজ করা হবে। তেমনি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে নম্রতা ও উৎকৃষ্ট

দিয়ে মন্দ প্রতিহত না করলে আল্লাহর ইবাদত করা হবে না, বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে। চরম উস্কানির মুখেও মুমিনকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে এবং উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করতে হবে। যদি কেউ নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় রাগারাগি, কঠোরতা, উগ্রতা বা সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হন তবে তিনি নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাবেন মাত্র, আল্লাহর ইবাদত করা হবে না। প্রতিটি মানুষকেই আল্লাহ ফিতরাত-এর ওপর সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকের মধ্যেই ভালো আছে। পরিবেশের ফলে অনেকের মধ্যে তা বীজ বা চারা রূপেই রয়ে গিয়েছে, পরিচর্যার অভাবে বৃক্ষ বা নিয়ন্ত্রক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি। সমাজের সবচেয়ে খারাপ মানুষটির মধ্যেও ভালোর বীজ সুপ্ত রয়েছে। উগ্রতা, কঠোরতা, সমালোচনা বা গালাগালির বুলডোজার দিয়ে সে বীজ বা চারাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা দা'ঈর কাজ নয়। দা'ঈর দায়িত্ব হলো ভালোবাসা, বিনম্রতা ও আন্তরিকতার পরিচর্যা দিয়ে মানুষের মধ্যকার কল্যাণমুখিতার বীজ বা চারাকে বৃক্ষে রূপান্তরিত করা।

ফলাফল প্রাপ্তির ব্যস্ততা

সঠিক জ্ঞানের অভাব ও আবেগের প্রভাবে আমরা যে সকল বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হতে পারি তার অন্যতম হলো, ফলাফল লাভের জন্য তাড়াহুড়া ও ব্যস্ততা বা ফলাফলের ভিত্তিতে দা'ওয়াতের সফলতা বিচার। দা'ওয়াত বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করছি, ফলাফল সন্ধান করছি না। অনেক সময় আবেগী মুমিনের মনে ফলাফল

লাভের উন্মাদনা তাকে বিপথগামী করে ফেলে। আমরা চাই যে, সমাজ থেকে ইসলাম ও মানবতা বিরোধী সকল অন্যায় ও পাপ দূরীভূত হোক। কোন মুমিনের মনে হতে পারে যে, এত ওয়াজ, বক্তৃতা, বই-পত্র, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদিতে কিছুই হলো না, কাজেই তাড়াতাড়ি কীভাবে সব অন্যায় দূর করা যায় তার চিন্তা করতে হবে। এ চিন্তা তাকে অবৈধ বা ইসলামে অনুমোদিত নয় এমন কর্ম করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কুমন্ত্রণা দিতে পারে।

মহান আল্লাহ সূরা আল-মায়েদাহে'র ১০৫ আয়াতে বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡ﴾

[المائدة: ١٠٥]

“হে মুমিনগণ, তোমাদের উপরে শুধু তোমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তা হলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ১০৫]

তাহলে আমাদের দায়িত্ব হলো নিজেদের হিদায়াত। আর নিজের হিদায়াতের অংশ হলো দীনের প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা। আমাদের আদেশ-নিষেধ সত্ত্বেও যদি কেউ বা সকলে বিপথগামী হয় তবে সেজন্য আমাদের কোনো পাপ হবে না বা আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে দায়ী হতে হবে না। অনেক নবী শত শত বছর দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধ করেছেন, কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ সুপথপ্রাপ্ত হয় নি। এতে তাঁদের মর্যাদায় কোনো কমতি হবে না বা তাঁদের দায়িত্ব পালনে কোনো

কমতি হয় নি। কাজেই মুমিন কখনই ফলাফলের জন্য ব্যস্ত হবেন না। বরং নিজের দায়িত্ব কুরআন ও হাদীসের আলোকে পালিত হচ্ছে কিনা সেটাই বিবেচনা করবেন।

বর্তমান যুগে দীনের কাজে লিপ্ত মানুষেরাও জড়বাদী-বস্তুবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। আমরা আল্লাহর ইবাদতের সাফল্যও দুনিয়াবী ফলাফল দিয়ে বিচার করতে চাই। অথচ ইসলামের মূল শিক্ষাই হলো আখেরাতমুখিতা। দুনিয়াতে আল্লাহ কি ফলাফল দিবেন সেটা তাঁরই ইচ্ছা। মুমিনের চিন্তা হলো তার ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হলো কিনা এবং সে আখেরাতে তার পুরস্কার পাবে কিনা। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি দয়া করে আমাদেরকে দুনিয়ামুখিতা থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের হৃদয়গুলোকে আখেরাতমুখি করে দেন।

দা'ওয়াতের অজুহাতে ব্যক্তিগত আমলে ত্রুটি

সঠিক জ্ঞানের অভাব ও আবেগের প্রভাবে কেউ কেউ অন্যকে ভালো করার আশায় নিজে পাপে লিপ্ত হন বা নিজের নেককর্মে অবহেলা করেন। কখনো ফরযে আইন বাদ দিয়ে ফরযে কিফায়া পালন করেন। কখনো অন্যকে ভালো করার জন্য নিজে গুনাহ করেন এবং কখনো অন্যের ভালোর আশায় নিজের ব্যক্তিগত নফল মুস্তাহাব আমলে অবহেলা করেন।

ফরযে আইন বাদ দিয়ে ফরযে কিফায়া পালন করা

আমরা দেখেছি যে, দা‘ওয়াত, আদেশ, নিষেধ বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক দায়িত্ব ও ফরযে কিফায়া। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট কিছু মানুষ এ দায়িত্ব পালন করলে বাকীদের জন্য তা নফলে পরিণত হয়। যিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন তিনি এর মহান সাওয়াব ও মর্যাদা অর্জন করবেন। কিন্তু অন্যদের কোনো গুনাহ হবে না। পক্ষান্তরে, পিতামাতার খেদমত, স্ত্রী-সন্তানদের ভরণপোষণ, তাদের পূর্ণ মুসলিমরূপে প্রতিপালন, কর্মস্থলের চুক্তি পালন ইত্যাদি মুসলিমের জন্য ফরযে আইন। দা‘ওয়াতের অগণিত সাওয়াব ও ফযীলতের কথা শুনে বা বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী করার আবেগে যদি আমরা আমাদের ফরযে আইন ইবাদতগুলোতে অবহেলা করে ফরযে কিফায়া বা নফল পর্যায়ের দা‘ওয়াত, আদেশ বা নিষেধে রত হই তাহলে তা আমাদের ধ্বংস ও ক্ষতির পথ প্রশস্ত করবে।

ওয়াজিব-সুন্নাত বর্জন করা বা হারাম-মাকরূহে লিপ্ত হওয়া

নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও অপরের প্রতি আমার দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য বুঝা আমাদের জন্য জরুরি। অনেক সময় দ্রুত ফলাফল লাভের চিন্তা মুমিনকে অন্যের ভালো করার প্রচেষ্টায় নিজে অন্যায় করতে প্ররোচিত করে। যেমন, একজন মদ খাচ্ছেন। তাকে দা‘ওয়াত দেওয়ার জন্য আমি তার সাথে বসে কিছু মদ পান করি অথবা একজন বেপর্দা মহিলাকে দা‘ওয়াত দেওয়ার জন্য আমিও নিজের পর্দা নষ্ট করি। এভাবে দা‘ওয়াতের নামে সিনেমা ইত্যাদি দেখা, জামা‘আতে সালাত নষ্ট করা, দাড়ি কাটা বা অন্য কোনো শরী‘আত নিষিদ্ধ বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করা

সবই এ পর্যায়ের। অনেক সময় শয়তানি প্ররোচনায় মুমিন এগুলোকে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত ও প্রজ্ঞা বলে মনে করতে পারেন। আসলে বিষয়টি বিভ্রান্তি। হিকমতের অর্থ দা'ওয়াত গ্রহণকারীর মানসিক প্রস্তুতির আলোকে শরী'আত অনুসারে দা'ওয়াত প্রদান। নিজে পাপে লিপ্ত হওয়া বা নিজের নেক আমল নষ্ট করা কখনই হিকমত নয়, বরং নফসানিয়্যাত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ।

ব্যক্তিগত নফল-মুস্তাহাব ইবাদতে ত্রুটি করা

অনেক সময় আবেগের বশবর্তী হয়ে মুমিন দা'ওয়াত বা আদেশ নিষেধের জন্য তাহাজ্জুদ, যিকির, তিলাওয়াত ও অন্যান্য সুন্নাত-মুস্তাহাব ইবাদত পালনে ত্রুটি করেন। মুমিনের মনে হতে পারে, আগে দা'ওয়াত, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদির মাধ্যমে দীনের বিজয় ও তা প্রতিষ্ঠিত করে এরপর আমি আমার ব্যক্তিগত তাকওয়া, সুন্নাত, তাহাজ্জুদ, যিকির, তাযকিয়া ইত্যাদি বিষয়ে নজর দিব। অথবা আমি তো সবচেয়ে বড় কাজে লিপ্ত রয়েছি কাজেই অন্য নেক আমল না করলেও চলে। বিষয়টি ওয়াসওয়াসা এবং ভুল বুঝা ছাড়া কিছুই নয়।

এখানে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার:

প্রথমত, ফরযে আইন ইবাদতে ত্রুটি করে ফরযে কিফায়া বা নফল ইবাদত বৈধ নয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতামাতার খেদমত ত্যাগ করে আল্লাহর পথে জিহাদে শরীক হতে অনুমতি দেন নি, যদিও জিহাদের ফযীলত অকল্পনীয়।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মহান সাহাবীগণের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, দীনের দা'ওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার কারণে তারা ব্যক্তিগত তাযকিয়া. নফল ইবাদত, তাহাজ্জুদ, যিকির, ক্রন্দন ইত্যাদির সামান্যতম কমতি করেন নি।

তৃতীয়ত, দীনের দা'ওয়াত ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফাইনাল পর্যায় বলে কিছু নেই। এটি একটি স্থায়ী ও চলমান প্রক্রিয়া। হক ও বাতিলের সংঘাত কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। বিজয়ের চাকা এদিকে ওদিকে ঘুরবে। কাজেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমার দা'ওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেমে যাবে এবং আমি অন্য কাজে মনোযোগ দিতে পারব, এরূপ চিন্তা ওয়াসওয়াসা ও বিভ্রান্তি মাত্র।

চতুর্থত, অগণিত নবী-রাসূল, মুজাহিদ ও দা'ঈ ইলাল্লাহ, তাঁদের আজীবন কর্ম করেও জাগতিক ফলাফল দেখে যান নি। তারা কখনই উপরের ওয়াসওয়াসার প্রভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত ফরয দায়িত্ব বা ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক ও তাযকিয়ার বিষয়ে ত্রুটি করেন নি।

পঞ্চমত, মুমিনের কাজ দু'টি। আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক গভীর করা ও অন্য মানুষদেরকে দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে এই পথে আহ্বান করা। প্রথম কাজটির গুরুত্ব দ্বিতীয় কাজটির চেয়ে অনেক বেশি। কারণ, প্রথম কাজে বান্দা নিজের ইচ্ছায় এগোতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের ফলাফল বান্দার নিজের ইচ্ছার মধ্যে নয়। কাজেই কেউ যদি দ্বিতীয় কর্মের ফলাফল লাভের ওপর প্রথম কর্ম বন্ধ করে

রাখেন তাহলে তার আখিরাতের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন।

দা'ওয়াত ও সংশোধন বনাম বিচার ও শাস্তি

সঠিক জ্ঞানের অভাবে ও আবেগের প্রভাবে যে কঠিন ভুল ঘটে যেতে পারে তা হলো আদেশ নিষেধের নামে বিচার-শাস্তি প্রদান। আদেশ-নিষেধ ও বিচার-শাস্তির মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতা অনুসারে অন্যায়কে পরিবর্তন করা বা অন্যায় বন্ধ করা মুমিনের দায়িত্ব। কিন্তু অন্যায় বন্ধ করা এবং অন্যায়ের বিচার ও শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ দুইটি পৃথক দায়িত্ব। প্রথমটি সকল মুসলিমের করণীয়। আর বিচার ও শাস্তি একমাত্র রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্ব। রাষ্ট্র যেন তার ওপর অর্পিত সঠিক বিচার-শাস্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে সে জন্য মুমিন যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মুমিনকে বিচার নিজ হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় নি। এজন্য ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যায়ের পরিবর্তন হাত দিয়ে করতে বলেছেন, তরবারী বা অস্ত্র দিয়ে নয়।[30]

অতীত বা ভবিষ্যৎ অন্যায় বা অসৎ কাজের জন্য ওয়াজ নসীহত বা উপদেশ দিতে হবে। আর বর্তমানে কাউকে অন্যায়ে লিপ্ত দেখতে পেলে

---

[30] আল-কানযুল আকবর ১/৭৮।

সম্ভব হলে তাকে বিরত করতে হবে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বিচারের দায়িত্ব হাতে তুলে নেওয়া যাবে না। নিম্নের উদাহরণ থেকে আমরা তা বুঝতে পারব:

মদপান বা মাদক দ্রব্য গ্রহণ একটি কঠিন পাপ ও অন্যায়। ইসলামি শরী'আতে এর শাস্তি বেত্রাঘাত। যদি কোনো মুমিন কোথাও কাউকে মদপান বা নেশা গ্রহণ করতে দেখেন তাহলে তার দায়িত্ব হলো তা বন্ধ করার চেষ্টা করা। তিনি সম্ভব হলে তাকে শক্তি দিয়ে একাজ থেকে বিরত করবেন। না হলে তাকে বিরত হতে উপদেশ দিবেন। না হলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবেন এবং এই পাপ বন্ধ হোক তা কামনা করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি মদপানকারীর বিচার করতে পারবেন না বা শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি দিতে পারবেন না।

অনুরূপভাবে ব্যভিচার, ধর্মত্যাগ, খুন, চুরি ইত্যাদি কঠিন পাপ। ইসলামে এগুলোর শাস্তি বেত্রাঘাত, মৃত্যুদণ্ড বা হস্তকর্তন। কোনো মুমিন কাউকে এসকল পাপে লিপ্ত দেখতে পেলে তিনি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে তা বন্ধ করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তিনি কোনো অবস্থাতেই তার বিচার বা শাস্তি প্রদান করতে পারবেন না। বিচার ও শাস্তির জন্য ইসলামে নির্ধারিত প্রক্রিয়া রয়েছে। সাক্ষ্য, প্রমাণ, আত্মপক্ষ সমর্থন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার বাইরে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারকেরও নেই।

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, আপনি শাসক থাকা অবস্থায় যদি কাউকে ব্যভিচার বা

চুরির অপরাধে রত দেখতে পান তাহলে তার বিচার বিধান কী? (নিজের দেখাতেই কি বিচার করতে পারবেন?) আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আপনার সাক্ষ্যও একজন সাধারণ মুসলিমের সাক্ষ্যের সমান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।[31]

অর্থাৎ স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানও নিজের দেখার ভিত্তিতে বিচার করতে পাবেন না এবং তাঁর একার সাক্ষ্যেও বিচার হবে না।

অন্য এক ঘটনায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাত্রে মদিনায় ঘোরাফেরা করার সময় এক ব্যক্তিকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান। তিনি পরদিন সকালে সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান তাহলে তিনি কি শাস্তি প্রদান করতে পারবেন? তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কখনই না। আপনি ছাড়া আরো তিনজন প্রত্যক্ষ্যদর্শী সাক্ষী যদি অপরাধের সাক্ষ্য না দেয় তাহলে আপনার উপরে মিথ্যা আপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।[32]

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষনীয়, তা হলো দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য। কোনো অন্যায় সংঘটিত হতে দেখলে সাধ্যমত তা পরিবর্তন বা প্রতিবাদ-প্রতিকার করতে হবে। কিন্তু যদি কোথাও অন্যায় হচ্ছে শুনে সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে অন্যায় সংঘটিত হয়ে গিয়েছে। এখন আর কেউ তাতে লিপ্ত নেই। এই অবস্থায় বিষয়টি বিচার্য বিষয়ে পরিণত

---

[31] সহীহ বুখারী।

[32] আল-কানযুল আকবর ১/২২৭।

হবে। এক্ষেত্রে কোনো মানুষ কোনো অবস্থাতেই অমুক কিছুক্ষণ আগে অমুক অপরাধে লিপ্ত ছিল, বলে তাকে বিচার করতে পারবেন না বা শাস্তি দিতে পারবেন না। প্রয়োজন ও সুযোগ অনুসারে উপদেশ নসীহত করবেন বা আইনে সোপর্দ করবেন।

অনেক সময় সঠিক বিচার হবে না, বা শরী'আত সম্মত বিচার হবে না এ চিন্তা কাউকে বিচার হাতে তুলে নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের আবারো মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দায়িত্ব হলো, আদেশ, নিষেধ ও আহ্বান। বিচার করা বা সকল অন্যায় মিটিয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব নয়। সঠিক বিচার বা ইসলাম সম্মত বিচার না থাকলে তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সাধ্যমত আদেশ-নিষেধ করা বা তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বিচার হাতে তুলে নেওয়ার কোনো অধিকার আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দেন নি। দা'ওয়াতের পরেও যদি সঠিক বিচার না হয় বা শরী'আত বিরোধী বিচার হয় তবে সেজন্য সংশ্লিষ্টরা আল্লাহর নিকট অপরাধী হবেন এবং দা'ঈগণ বিমুক্ত থাকবেন। সঠিক বিচার হবে না মনে করে গণপিটনি, ভাংচুর বা আইন হাতে তুলে নেওয়া কঠিন অন্যায় ও হারামসমূহের অন্যতম। লোকটি সত্যিকার অপরাধী কিনা, কতটুকু অপরাধী এবং এই অপরাধে ইসলামে তার শাস্তি কি, তা নির্ধারণ করার জন্য শরী'আতের সঠিক প্রক্রিয়ার বাইরে কিছু করার অর্থই হলো যুলুম। আর পূর্বের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, এতে অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, এখেনে উপস্থিত থাকলেও লা'নতের ভাগী হতে হবে।

আদেশ-নিষেধ বনাম গীবত-অনুসন্ধান

কুরআন হাদীসের জ্ঞানের অভাবে ও আবেগের প্রভাবে আমরা আরেকটি ভুল করি। আমরা আদেশ-নিষেধের নামে পরচর্চা ও দোষ খোঁজায় লিপ্ত হই। আদেশ-নিষেধ এবং পরনিন্দা ও গোপন দোষ অনুসন্ধানের মধ্যে পার্থক্য আসমান ও জমিনের। প্রথমটি ফরয ইবাদত আর দ্বিতীয়টি হারাম, কবীরা গুনাহ।

মহান আল্লাহ যেমন অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি তিনি অন্যের গোপন অন্যায় বা দোষ খোঁজ করতেও নিষেধ করেছেন। যে অন্যায় প্রকাশ্যে দেখতে পাবেন, আপনি প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ-প্রতিকার করবেন। আপনি যে অন্যায় কাজটি দেখতে পেয়েছেন তা যদি অন্যেরা না দেখে তাহলে আপনি অন্যায়কারীকে ভয় প্রদর্শন বা আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করবেন। একান্ত বাধ্য না হলে বা মানবাধিকার তথা হক্কুল ইবাদ সংশ্লিষ্ট না হলে বিষয়টি আইন বা জনসম্মুখে তুলবেন না।

কারো দোষ গোপনে অনুসন্ধান করা বা গোপন দোষ জানার চেষ্টা করা হারাম। অনুরূপভাবে কারো কোনো গোপন অন্যায় বা দোষের কথা জানলে তা প্রকাশ না করে গোপন রাখা এবং গোপনেই তাকে নসীহত করা হাদীসের নির্দেশ। সর্বোপরি কারো দোষের কথা তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করা গীবত বা পরচর্চা এবং তা কঠিনতম হারাম কাজ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কারো অন্যায়ের কথা মানুষের কাছে বলে বেড়ানোর নাম সৎকাজে আদেশ বা অসৎকাজে নিষেধ করা নয়,

বরং এই কাজটিই একটি অসৎকাজ। আল্লাহ তা'আলা সূরা হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢﴾ [الحجرات: ١٢]

“হে মুমিনগণ তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِيَّاكُمْ والظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ولا تَحَسَّسُوا ولا تَجَسَّسوا ولا تَنَافَسُوا ولا تَحَاسَدُوا ولا تَبَاغَضُوا ولا تَدَابَرُوا وكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا»

“খবরদার! তোমরা অবশ্যই অনুমান থেকে দূরে থাকবে। কারণ, অনুমাণই হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় জানার চেষ্টা করবে না। গোপন দোষ অনুসন্ধান করবে না, পরস্পর হিংসা করবে না, পরস্পরে বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না এবং

পরস্পরে শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। তোমরা পরস্পরে আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও।”[33]

এভাবে আমরা জানতে পারছি যে, অনুমানে কথা বলা এবং অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা হারাম। শুধু তাই নয়, অনুসন্ধান ছাড়াও যদি অন্যের কোনো দোষক্রুটি মানুষ জানতে পারে তা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা গীবত ও হারাম। গীবত হলো ১০০% সত্য কথা। কোনো ব্যক্তির ১০০% সত্য দোষ-ক্রুটির কথা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করার নামই গীবত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«إنَّ رسُولَ الله صلي الله عليه وسلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوا اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أخَاكَ بَمَا يَكْرَهُ قِيْلَ أفَرَأيْتَ إنْ كَانَ في أخِي مَا أقُولُ قَالَ إنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وإنْ لَمْ يَكُن فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জান! গীবত বা অনুপস্থিতের নিন্দা কী? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভালো জানেন। তিনি বলেন, তোমার ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। তখন প্রশ্ন করা হলো, বলুন তো আমি যা বলছি তা যদি সত্যই আমার ভাইয়ের মধ্যে বিরাজমান হয় তাহলে কী হবে? তিনি বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিরাজমান থাকে তাহলে তুমি

[33] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি তার মিথ্যা অপবাদ করলে।"[34]

আমরা ভাবি, সত্য কথা বলব তাতে অসুবিধা কী? আমরা হয়ত বুঝি না বা প্রবৃত্তির কুমন্ত্রনায় বুঝতে চাই না যে, সব সত্য কথা জায়েয নয়। অনেক সত্য কথা মিথ্যার মত বা মিথ্যার চেয়েও বেশি হারাম। আবার কখনও বলি, আমি এ কথা তার সামনেও বলতে পারি। আরে সামনে যা বলতে পারেন তা পিছনে বলাই তো গীবত।

গীবত অর্থাৎ অন্যের দোষত্রুটি তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করা অত্যন্ত আনন্দদায়ক কর্ম। মানবীয় প্রবৃত্তি তা খুবই পছন্দ করে। কুরআনে এ জন্য একে গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। গোশত খাওয়া খুবই মজাদার, তবে নিজ মৃতভাইয়ের গোশত খাওয়া মজাদার নয়, ঘৃণ্য কাজ। কুরআনের নির্দেশনা যার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে সেই মুমিন অনুভব করেন যে গীবতের মাধ্যমে তিনি মৃতভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করছেন। এজন্য কাজটি তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য। কিন্তু আমরা দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা তা বুঝতে পারি না, বরং গরুর ভুনা গোশতের মতোই পরিতৃপ্তির সাথে আমরা তা ভক্ষণ করি।

মানব প্রবৃত্তির কাছে গীবত মজাদার বস্তু হওয়ার দুইটি কারণ:

প্রথমত, নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বিরক্তিকর। অন্যের দোষ আলোচনা করলে এ বিরক্তি থেকে বাঁচা যায়।

---

[34] সহীহ মুসলিম।

দ্বিতীয়ত, নিজের ভালোত্ব, ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সহজ উপায় গীবত। নিজের বড়ত্ব নিজে বলা একটু খারাপ দেখায়। অন্যদের গীবতের মাধ্যমে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, সকলেই দোষযুক্ত, আমি অনেক ভালো।

মানবীয় দুর্বলাতার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يُبْصِرُ أَحَدُكُمْ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَ يَنْسَي الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ»

“তোমাদের মধ্যে একজন মানুষ নিজ ভাইয়ের চোখের সামান্য কুটা টুকু দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখের মধ্যে বিশাল বৃক্ষের কথা ভুলে যায়।”[35]

গীবতের নিন্দায় এবং এর কঠোরতম শাস্তির বর্ণনায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা দা‘ওয়াত কেন্দ্রিক ঘৃণ্য গীবত ও গীবতের কারণগুলো বুঝতে চাই। আমাদের সমাজে দা‘ওয়াতে লিপ্ত সম্মানিত মুমিনগণকে শয়তান বিভিন্নভাবে গীবতে লিপ্ত করে। তন্মধ্যে প্রধান পথ দুইটি:

১. পাপে বা অন্যায়ে লিপ্তগণের গীবত এবং

২. দা‘ওয়াতে লিপ্ত অন্য মুসলিমের গীবত।

পাপীর গীবত

---

[35] সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৫৭৬১; মাওয়ারিদুয যামআন: ৬/৯০, হাদীসটি সহীহ। শাইখ আল-আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

দা‘ওয়াতে লিপ্ত মুমিন স্বভাবতই পাপে লিপ্ত মানুষদেরকে অপছন্দ করেন। এদের মধ্যে অনেকেই ক্ষমতাধর বা তাদের সামনে কিছু বলার সুযোগ তিনি পান না। এজন্য এদের অনুপস্থিতিতে সুযোগ পেলেই এদের বিভিন্ন দোষ বা অপরাধ আলোচনা করেন। তিনি মনে করেন, এভাবে তিনি পাপের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি গীবত ও অপরাধের মাধ্যমে হারামে লিপ্ত হচ্ছেন এবং নিজের আমল ধ্বংস করছেন। অমুক কর্ম পাপ এবং আমি তা ঘৃণা করি। যারা এতে লিপ্ত সবাই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত, একথা বললে পাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু অমুক ব্যক্তি অমুক পাপে লিপ্ত, একথা তার অনুপস্থিতিতে বললে সন্দেহাতীতভাবে গীবত হবে।

এই হারামকে হালাল হবার জন্য একটি বানোয়াট হাদীস বলা হয়:

«لَيْسَ لِفَاسِقٍ غِيْبَةٌ»

“পাপীর গীবত নেই।” অর্থাৎ পাপীর দোষ পিছনে আলোচনা করলে গীবত হয় না। হাদীসটি বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল।[36] এখানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষনীয়:

প্রথমত, পাপীর গীবত না হলে দুনিয়াতে গীবত বলে কিছু থাকে না। আমরা সকলেই পাপী। কিছু না কিছু পাপে আমরা সকলেই জড়িত। আর গীবত তো সত্য দোষ বলা। এজন্য নিষ্পাপ মানুষের তো গীবত হবে না, অপবাদ হবে। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য নির্দেশনা থেকে আমরা নিশ্চিত জানি যে, যে কোনো পাপীর যে কোনো প্রকারের

---

[36] মুখতাসারুল মাকাসিদ, ১৬৪ পৃ. জয়ীফুল জামে, ৭০৯ পৃ.।

দোষক্রুটি, যা তার অনুপস্থিতিতে আলোচিত হয়েছে জানলে তার খারাপ লাগে, তা তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করাই গীবত।

দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তির দোষক্রুটির কথা তার অনুপস্থিতিতে বলার একটিই শরী'আতসম্মত কারণ আছে, তা হলো, অন্য কাউকে অধিকতর ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এক্ষেত্রেও মুমিনকে বুঝতে হবে যে, একাজটি একটি ঘৃণিত কাজ। একান্তই বাধ্য হয়ে তিনি তা করছেন। কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই না বলা।

তৃতীয়ত, গীবত কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে হারাম করা হয়েছে। কুরআন-হাদিসে স্পষ্টভাবে গীবতকে কোনো অবস্থাতেই হালাল বলা হয় নি। শুধু কোনো মানুষ বা জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার একান্ত প্রয়োজনে তা বৈধ হতে পারে বলে আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন। এখন মুমিনের কাজ হলো কুরআন ও হাদীস যা নিষেধ করেছে তা ঘৃণাভরে পরিহার করা। এমনকি সে কর্মটি কখনো জায়েয হলেও তিনি তা সর্বদা পরিহার করার চেষ্টা করবেন। শূকরের মাংস, মদ, রক্ত ইত্যাদি আল্লাহ হারাম করেছেন এবং প্রয়োজনে জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। এখন মুমিনের দায়িত্ব কী? বিভিন্ন অজুহাতে প্রয়োজন দেখিয়ে এগুলো ভক্ষণ করা? নাকি যত কষ্ট বা প্রয়োজনই হোক তা পরিহার করার চেষ্টা করা?

গীবত ও ঠিক অনুরূপ একটি হারাম কর্ম যা একান্ত প্রয়োজনে বৈধ হতে পারে।

গীবত ও শূকরের মাংসের মধ্যে দু'টি পার্থক্য:

প্রথম পার্থক্য হলো শূকরের মাংস যে প্রয়োজনে খাওয়া যেতে পারে তা কুরআনেই বলা হয়েছে, পক্ষান্তরে গীবতের ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু কুরআন বা সহীহ হাদীসে বলা হয় নি।

দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, সাধারণভাবে শূকরের মাংস ভক্ষণ করা শুধুমাত্র আল্লাহর হকজনিত পাপ। সহজেই তাওবার মাধ্যমে তা ক্ষমা হতে পারে। পক্ষান্তরে গীবত বান্দার হকজনিত পাপ। এর ক্ষমার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা প্রয়োজন। এজন্য মুমিনের দায়িত্ব হলো বিভিন্ন অজুহাতে বা জয়ীফ-মওজু হাদীসের বরাত দিয়ে এ পাপে লিপ্ত না হয়ে যথাসাধ্য একে বর্জন করা।

চতুর্থত, আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর দায়িত্ব হলো যথাসাধ্য পরিবর্তন ও সংশোধন। গীবতের মাধ্যমে কখনই কোনো পাপের পরিবর্তন বা সংশোধন হয় নি বা হয় না। এতে শুধুমাত্র নিজের পাপ বৃদ্ধি পায়।

দা‘ঈর গীবত

দা‘ঈগণ কখনো কখনো একে অন্যের গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। দীনের দা‘ওয়াতে রত মুসলিমগণ এখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত। দীন পালনের মাধ্যম হিসাবেই আমরা দল করি। এ সকল দলের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যের অনেক বিষয় পদ্ধতিগত ও ইজতিহাদ কেন্দ্রিক। কিছু বিষয় কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতেই অন্যায় ও আপত্তিকর। প্রথম ক্ষেত্রে মতভেদ মেনে নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় ক্ষত্রে ভুলগুলো সংশোধনের জন্য উপরে বর্ণিত দা‘ওয়াতের নিয়মাবলী অনুসারে তাদেরকে আদেশ, নিষেধ ও দা‘ওয়াত করতে হবে।

কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, এগুলোর পরিবর্তে আমরা একদলের কয়েকজন একত্রিত হলে বা কোনো সুযোগ পেলে অন্য দলের বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা মতামতগত ভুলত্রুটি আলোচনা করে গীবতে রত থাকি। এতে কোনো মানুষ সংশোধিত হয় না বা দীনের কোনো উপকার হয় না। এ জাতীয় গীবত থেকে আমরা কয়েকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই:

প্রথমত, কঠিন হারাম কর্ম করে নিজের আখেরাত নষ্ট করি।

দ্বিতীয়ত, গীবতে ব্যস্ত থাকার ফলে আল্লাহর যিকির ও নিজের ভুলত্রুটি স্মরণ করে তাওবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই।

তৃতীয়ত, অন্যের ভুলত্রুটি আলোচনা করার মাধ্যমে নিজেদের মনে আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কার আসে, যা মুমিনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

চতুর্থত, বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের দিন গীবতকারীর সাওয়াব গীবতকৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে এবং গীবতকৃতর পাপ বা ভুলত্রুটির কারণে যে সকল মানুষদের আমরা অপছন্দ করি, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কষ্টার্জিত সাওয়াব তাদেরকে দান করছি এবং তাদের পাপগুলো আমরা গ্রহণ করছি।

সংশোধন বনাম দোষ গোপন

অন্যের দোষ যেমন তার অনুপস্থিতে বলতে নিষেধ করা হয়েছে, অপরদিকে তা গোপন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“মুসলিম মুসলিমের ভাই। একজন আর একজনকে যুলুম করে না এবং বিপদে পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাতে ব্যস্ত থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাতে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কষ্ট-বিপদ দূর করবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।”[37]

মিশরের গভর্নর সাহাবী উকবা ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেক্রেটারী আবুল হাইসাম দুখাইন বলেন, আমি উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী মদপান করছে। আমি এখনি যেয়ে পুলিশ ডাকছি যেন তাদের ধরে নিয়ে যায়। উকবা বলেন, তুমি তা করো না, বরং তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও এবং ভয় দেখাও।....আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مؤمِنٍ فَكأَنَّمَا استَحْيَا مَوءُودَةً فِي قَبْرِهَا»

“যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দোষ গোপন করল সে যেন কোনো জীবন্ত প্রোথিত নারীকে তার কবরে জীবিত করে দিল।”[38]

উপরের হাদীসগুলোর আলোকে আমরা বুঝতে পারছি যে মুমিন আল্লাহর পথে আহ্বান করবেন। কোনো অন্যায় দেখলে তা সংশোধনের চেষ্টা

[37] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[38] সহীহ ইবন হিব্বান।

করবেন। কিন্তু কখনই মুমিন অন্যের গোপন দোষ অনুসন্ধান করবেন না। কারো কোনো দোষ জানতে পারলে তা গোপন রাখবেন। সাধ্যমত গোপনেই তা সংশোধনের চেষ্টা করবেন। তিনি কারো গোপন দোষ অন্যের সামনে প্রকাশ করবেন না। সংশোধনের প্রয়োজনে একান্ত বাধ্য হলে শুধুমাত্র যাকে বললে সংশোধন হবে তাকেই বলবেন। কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ তিনি আলোচনা করবেন না। মুমিনের দায়িত্ব হলো মানুষকে ভালোপথে আনতে চেষ্টা করা। অহেতুক অন্যের দোষ আলোচনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ ও পাপ অর্জন মুমিনের দায়িত্ব নয়। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: সুন্নাতের আলোকে দা‘ওয়াত

ইবাদত পালনে সুন্নাতের গুরুত্ব

সুন্নাতের অর্থ ও পরিচয়

সুন্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো: মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন-পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি।

সাধারণভাবে সুন্নাত বলতে আমরা বুঝি ফরয ও ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের নেককর্ম যা করা অত্যাবশ্যকীয় নয়, তবে উচিৎ, উত্তম ও প্রয়োজনীয়। তবে হাদীসে এবং সাহাবী তাবেয়ীনগণের পরিভাষায় সুন্নাত বলতে বুঝানো হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল প্রকারের নির্দেশ, কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ। এ ছাড়া তাঁর সাহাবীদের কর্ম ও আদর্শও এই অর্থে সুন্নাত বলে অভিহিত হয়।

সুন্নাতের অর্থ ও পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এহইয়াউস সুনান গ্রন্থে। এ পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই সুন্নাত। যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করেছেন তা সেভাবেই করা তাঁর সুন্নাত। যা তিনি করেন নি, অর্থাৎ বর্জন করেছেন তা না করা বা বর্জন করাই সুন্নাত। কোনো কর্ম পালন বা বর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব, পদ্ধতি, ক্ষেত্র, সময়, স্থান ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে সুন্নাতের বেশি বা কম হলে বা সুন্নাতের বাইরে গেলে তা খেলাফে সুন্নাত হবে। তিনি যা করেন নি বা খেলাফে

সুন্নাত, কর্ম কখনই দীনের অংশ বা ইবাদতের অংশ হতে পারে না। তবে জাগতিক কর্ম হিসাবে বা ইবাদতের উপকরণ হিসাবে শরী'আতের বিধানের আলোকে তা জায়েয বা নাজায়েয হতে পারে।

সুন্নাতের বাইরে কোনো ইবাদত কবুল হবে না

কুরআন-হাদীসের অগণিত নির্দেশনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর দরবারে যে কোনো ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো যে, সেই ইবাদতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত বা রীতি অনুসারে পালিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কেবলমাত্র ইবাদতের নির্দেশই দেননি, উপরন্তু প্রতিটি ইবাদত নিজে পালন করে ইবাদতটি পালনের বিশুদ্ধ পদ্ধতিও তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। প্রতিটি ইবাদত তাঁর পদ্ধতি বা সুন্নাত অনুসারে আদায় করা অত্যাবশ্যকীয়। সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো কর্ম বা পদ্ধতি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো ইবাদত যদি তাঁর পদ্ধতির বাইরে কোনোভাবে পালিত হয় তাহলে তো আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (কবুল হবে না)।[39]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন,

---

[39] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

«مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে অন্যমনস্ক হলো বা আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করলো তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।[40]

দা‘ওয়াতের কাজও সুন্নাত পদ্ধতিতে হতে হবে

তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, দা‘ওয়াত, তাবলীগ বা দীন প্রতিষ্ঠার ইবাদত পালন করতে আমাদেরকে হুবহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করতে হবে। দা‘ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার ইবাদতও যদি তাঁর সুন্নাত বা পদ্ধতির বাইরে পালিত হয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং কবুল হবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে কি আমাদের সে যুগের মতো উটের পিঠে চড়ে দা‘ওয়াতের জন্য চলাচল করতে হবে? আমরা কি মটরগাড়ী, এরোপ্লেন ইত্যাদিতে দা‘ওয়াতের জন্য চলাচল করতে পারব না? আমরা শুধু মুখে বা হাতে লিখেই দা‘ওয়াতের কাজ করব? আমরা কি আধুনিক মুদ্রণ, মাইক, রেডিও ইত্যাদি ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রনিক উপকরণাদি ব্যবহার করতে পারব না? তিনি দা‘ওয়াতের জন্য কোনো কারিকুলাম, সিলেবাস, সুনির্দিষ্ট বই-পুস্তক, কর্মসূচি, সময়, দিন, মাস, বৎসর, স্থান বা অন্য কোনো বিষয় নির্ধারণ করে দেন নি। তাহলে কি আমরা দিন, সময় বা স্থান নির্ধারণ করে বা বই পুস্তক ইত্যাদি নির্ধারণ করে দা‘ওয়াতের জন্য কোনো কারিকুলাম বা কর্মসূচী গ্রহণ করব না?

[40] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

ইবাদত ও উপকরণের পার্থক্য

বিষয়গুলো বুঝার জন্য আমাদেরকে ইবাদত ও ইবাদতের উপকরণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। আমি এহইয়াউস সুনান গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ে যথাসাধ্য বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি। দা'ওয়াতে রত মুমিনকে আমি সবিনয়ে আনুরোধ করব বইটি পড়ার জন্য। এখানে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেন নি বা নির্ধারণ করেন নি তা কখনই দীনের আংশ বা সাওয়াবের উৎস নয়। তবে তা ইবাদত পালনের উপকরণ হতে পারে।

ইবাদত পালনের ক্ষত্রে তিনি যে সকল উপকরণ বা পদ্ধতি ব্যবহার করেন নি তা দু প্রকারের। প্রথম প্রকারের উপকরণ তাঁর যুগে বিদ্যমান ছিল বা সে যুগে তার জন্য সেগুলো ব্যবহার করা সম্ভব ছিল, কিন্তু তিনি তা ব্যবহার করেন নি। এগুলো মুমিন ব্যবহার করবেন না। কারণ, রাসূল ইচ্ছাপূর্বক তা বর্জন করেছেন। অন্য প্রকারের উপকরণ যেগুলো তাঁর যুগে ছিল না, পরবর্তীযুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধানের আলোকে মুমিন ইবাদত পালনের উপকরণ হিসাবে প্রয়োজনে এ ধরনের উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু কখনই এর ব্যবহারকে ইবাদত বা ইবাদতের অংশ বলে মনে করতে পারেন না। সাওয়াব নির্ভর করবে মূল ইবাদত পালনের বিশুদ্ধতা, ব্যপকতা ও গভীরতার উপরে। এ সকল উপকরণের সাথে সাওয়াবের সামান্যতম সম্পর্ক থাকবে না।

দা‘ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পদ্ধতি ও উপকরণের সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত এবং এ বিষয়ক কিছু ভুলভ্রান্তি এখানে আলোচনা করতে চাই।

দা‘ওয়াতের মাসনূন পদ্ধতি ও উপকরণ

আদেশ, নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা দা‘ওয়াতের যে সকল উপকরণ ও পদ্ধতি কুরআন-হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন সে সকল মাসনূন বা সুন্নাতসম্মত উপকরণের অন্যতম হলো ১. কুরআন ২. হাদীস, ৩. হিকমাহ বা প্রজ্ঞা, ৪. সুন্দর ওয়াজ-উপদেশ, ৫. উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক, ৬. জিহাদ ৭. অনুকরণীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা, ৮. উৎসাহ, পুরস্কার ও শাস্তি।

কুরআন মাজীদ

কুরআনুল কারীম ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দা‘ওয়াতের প্রধান ও মূল উপকরণ। আল্লাহ তা‘আলা কুরআন কারীমে তাঁকে কুরআন পাঠ করে দা‘ওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। কাফিরগণকে দীনের দা‘ওয়াত দিতে এবং মুমিনগণকে দীনের দা‘ওয়াত দিতে উভয় ক্ষেত্রে তিনি নিজে সদা সর্বদা কুরআন পাঠ করে দা‘ওয়াত প্রদানকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন।

হাদীস ও হিকমাহ

কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনের পাশাপাশি হিকমত

বা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং তিনি তাঁর উম্মতকে কুরআনের পাশাপাশি প্রজ্ঞার মাধ্যমে দা'ওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠা করেন।[41]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত হিকমত বা প্রজ্ঞা বা তাঁর আজীবনের শিক্ষা হাদীস হিসেবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে।

সুন্দর ওয়াজ

সুন্দর ওয়াজ ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দা'ওয়াতের অন্যতম উপকরণ। কুরআনে তাঁকে ওয়াজের মাধ্যমে দা'ওয়াত দেওয়ার জন্য বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[42]

কুরআনকেও বারংবার ওয়াজ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[43]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াজের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তাঁর ওয়াজ ছিল মূলত কুরআন নির্ভর। বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি বক্তৃতা, ওয়াজ, খুৎবা ইত্যাদি সব কিছুতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন পাঠ করতেন। এগুলোর পাশাপাশি কিছু হিকমাহ বা উপদেশ প্রদান করতেন যা হাদীসরূপে সংকলিত। তাঁর ওয়াজের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা, আন্তরিকতা, কৃত্রিমতাহীন, সরলতা, সংক্ষেপন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

---

[41] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৯, ১৫১, ২৩১, ২৫১; সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪; সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৩; সুরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৪, সূরা আল-জুমু'আ, আয়াত: ২।

[42] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪; সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫।

[43] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৫; সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৭।

উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা বিতর্ক

উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা বিতর্ক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কুরআন অনন্য গ্রন্থ। ইয়াহূদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক বিভিন্ন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, আচার ইত্যাদির অসারতা, ভিত্তিহীনতা এবং ইসলামি বিশ্বাস ও কর্মের যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, সরল ও আকার্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলনীতিই হলো প্রতিপক্ষের পদ্ধতির চেয়ে দা'ঈর পদ্ধতি উৎকৃষ্টতর হতে হবে। ভাষা, ভাব, বিনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, আন্তরিকতা, উপস্থাপনা সকল দিক থেকেই তা হবে উৎকৃষ্টতর। প্রতিপক্ষের সম্মান প্রদান, তার ভালো গুণাবলীর প্রশংসা, ব্যক্তিগত আক্রমণ বর্জন, ঢালাও অভিযোগ বর্জন ইত্যাদি কুরআনী বিতর্ক আলোচনার বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন এই পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন।

জিহাদ

দা'ওয়াতের একটি কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতি ও উপকরণ হলো জিহাদ ও কিতাল। জিহাদ অর্থ শ্রম, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। কিতাল অর্থ যুদ্ধ। তবে ইসলামি পরিভাষায় সাধারণভাবে জিহাদ বলতে কিতাল বা যুদ্ধ বুঝানো হয়। এছাড়া দা'ওয়াতের কর্মকেও জিহাদ ও সর্বত্তোম জিহাদ বলা হয়েছে।

কুরআন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিতাল বা যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় ফরয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম ছিল দা'ওয়াত। জিহাদ-কিতাল রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার মাধ্যম।

দা‘ওয়াতের মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে আল্লাহ যুদ্ধ পর্যায়ের জিহাদ বৈধ করেন নি। কুরআন ও হাদীসে জিহাদ বৈধ হওয়ার যে সকল শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর অন্যতম হলো: (১) রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, (৩) রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ, (৪) কেবল সশস্ত্র যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করা। ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ বইয়ে আমি এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলো আলোচনা করেছি।

নিজ আচরণের মাধ্যমে উত্তম আদর্শ স্থাপন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা‘ওয়াতের অন্যতম উপকরণ ছিল নিজের জীবনে আদর্শের সর্বোত্তম বাস্তবায়নের মাধ্যমে উসওয়া হাসানাহ বা অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করা। ইবাদত, বন্দেগী, আল্লাহ-ভীতি, মানব কল্যাণ, সৃষ্টির সেবা, সততা, বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। দা‘ওয়াতের সফলতার এ হলো প্রধান উপায়।

উৎসাহ, পুরস্কার ও শাস্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা‘ওয়াতের অন্যতম প্রধান দিক ছিল উৎসাহ, পুরস্কার ও শাস্তি। তিনি প্রশংসনীয় কর্মে লিপ্ত মানুষদেরকে সুন্দর উপাধি, প্রশংসা, সম্মান, পুরস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসাহিত করেছেন। অপরদিকে অন্যায়ে লিপ্ত মানুষদের শাস্তি প্রদান, কর্মের নিন্দা ইত্যাদির মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করেছেন। সমাজে সৎ ও কল্যাণমুখী মানুষেরা যদি তাদের মূল্যায়ন না পান বা সততার কারণে তারা যদি বঞ্চিত ও অবহেলিত হন এবং অসৎ মানুষেরা গলাবাজি বা

অসততার মাধ্যমে পুরস্কৃত হন তাহলে আমাদের মুখের কথা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। মুখের আদেশ নিষেধ ও দা'ওয়াতের ন্যায় এ ধরনের প্রশংসা, সম্মান বা উৎসাহও দা'ওয়াতের অন্যতম মাসনূন পদ্ধতি। প্রত্যেককেই নিজের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অনুসারে এ দিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। দা'ওয়াতের জন্য এগুলো অন্যতম মাসনূন বা সুন্নাতসম্মত উপকরণ। দা'ওয়াতরত মুমিনের দায়িত্ব হলো যথাসম্ভব মাসনূন উপকরণের সুন্নাতসম্মত ব্যবহারের মাধ্যমে দা'ওয়াতের ইবাদত পালন করা।

মাসনূন উপকরণের নিষিদ্ধ ব্যবহার

উল্লেখ্য যে, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উপরের মাসনূন উপকরণগুলো অনেক সময় ইসলাম নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। আবেগ বা অজ্ঞতার ফলে দা'ঈ হয়ত ভাবেন যে, তিনি ইবাদত করছেন বা সাওয়াবের কাজ করছেন। অথচ তিনি মূলত পাপে লিপ্ত রয়েছেন।

ওহী-বহির্ভূত কথাকে ওহীর নামে চালানো

আমরা দেখেছি যে, ইসলামি দা'ওয়াত মূলত ওহী নির্ভর। আর এক্ষেত্রে ভয়ঙ্করতম অন্যায় হলো ওহীর নামে, অর্থাৎ আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা বলা। মিথ্যা সর্বাবস্থাতেই কঠিন পাপ। আর ওহীর নামে মিথ্যা ভয়ঙ্করতম পাপ। দা'ওয়াতে রত মুমিন বিভিন্নভাবে এ কঠিন পাপে লিপ্ত হতে পারেন:

ওহীর নামে মিথ্যা বলা

মানবীয় কথাকে ওহীর নামে চালানোর প্রধান পদ্ধতি হলো আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন নি তা তাদের নামে বলা বা তাঁদের নামে কথিত মিথ্যা বা সন্দেহজনক কথা প্রচার করা।

দা‘ওয়াত যেহেতু ওহী নির্ভর সেহেতু দা‘ওয়াতরত ব্যক্তি চান যে, তার দা‘ওয়াতের পক্ষে ওহীর বাণী শুনাবেন। ওহীর কোনো বাণী না পেলে কেউ কেউ শয়তানের প্ররোচনায় মনগড়া বানোয়াট কথাকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলে প্রচার করেন। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষদেরকে ভালো পথে ডাকা ও খারাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ জাল হাদীস তৈরী ও প্রচার করা হয়েছে। বিভিন্ন নেক কাজের ফযীলত ও বিভিন্ন পাপের শাস্তির বর্ণনায় অগণিত বানোয়াট কথা জালিয়াতি করে হাদীস বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে, মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সকল জালিয়াতি উদঘাটন ও চিহ্নিত করেছেন।

শয়তান এ সকল জালিয়াতকে বুঝিয়েছে যে, ভালো পথে ডাকার জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীস যথেষ্ট নয়। কাজেই ভালো উদ্দেশ্যে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা বলতে পার। বর্তমান যুগেও দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে মিথ্যা, অনির্ভরযোগ্য ও দুর্বল হাদীসের ছড়াছড়ি অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষণীয়। কোন হাদীসে কত বেশি ফযীলত, সাওয়াব বা শাস্তির কথা বলা আছে, অথবা কোন হাদীসে কত আকর্ষণীয় গল্প আছে সেটাই শুধু লক্ষ্য করেন অনেক

দা‘ঈ। কোন হাদীসের সনদ কতটুকু শক্তিশালী তা বিবেচনা করতে তারা আগ্রহী নন। এরা হয়ত ভাবেন, শুধু কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস দিয়ে বোধহয় মানুষকে আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। যুগে যুগে এ প্রবণতা পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে ধ্বংস করেছে। কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত কঠিনভাবে এ প্রবণতাকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ [الانعام: ٢١]

“আল্লাহর নামে বা আল্লাহর সম্পর্কে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে?”[44]

কুরআন কারীমে একাধিক স্থানে না জেনে, আন্দাজে বা অনুমান নির্ভর করে আল্লাহ, আল্লাহর দীন, বিধান ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। সূরা আল-আ‘রাফের ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে:

﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣﴾ [الاعراف: ٣٣]

“বল, আমার রব নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসঙ্গত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক করা

[44] সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ২১, ৯৩, ১৪৪; সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩৭; সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৭; সূরা হূদ, আয়াত: ১৮; সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ১৫; সূরা আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ৬৮; সূরা আস-সফ, আয়াত: ৭।

যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেন নি এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩৩]

সূরা আল-বাকারার ১৬৮-১৬৯ আয়াতেও অনুরূপ এরশাদ করা হয়েছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ»

“তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না। কারণ, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।”[45]

সালামাহ ইবনল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ ما لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

“আমি যা বলি নি তা যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।”[46]

আশারায়ে মুবাশ্‌শারাসহ প্রায় ১০০জন সাহাবী এ অর্থে বিভিন্ন হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, সকল হাদীসের অর্থ একই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি তার নামে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা আন্দাজ অনুমান করে বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এর শাস্তি জাহান্নাম।

---

[45] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[46] সহীহ বুখারী।

কোনো হাদীসের নির্ভুলতার বিষয়ে সন্দেহ হলে তা হাদীস হিসেবে গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। যদি কেউ যাচাই না করে যা শুনে তাই হাদীস বলে গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে তাহলে হাদীস যাচাইয়ে তার অবহেলার জন্য সে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার পাপে পাপী হবে। উপরন্ত, যদি কোনো হাদীসের নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি সে হাদীস বর্ণনা করে তাহলে সেও মিথ্যা হাদীস বলার পাপে পাপী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كَفَى بِالْمَرءِ اثْمًا أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ»

“একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে।”[47]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন,

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ»

“যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদীস বলবে এবং তার মনে সন্দেহ হবে যে, হাদীসটি মিথ্যা হতে পারে, সেও একজন মিথ্যাবাদী।”[48]

দা‘ওয়াতে রত মুমিনগণকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আমি যদি আজীবন একটি হাদীসও না বলি বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কিছুই না বলি তাহলে হয়ত আমার কোনো গোনাহ হবে না। কিন্তু আমি দা‘ওয়াতের কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো মিথ্যা বা সন্দেহজনক হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[47] সহীহ মুসলিম।

[48] সহীহ মুসলিম।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে বলে ফেলি তাহলে হয়ত আমাকে মিথ্যাবাদীরূপে কিয়ামতের দিন উঠতে হতে পারে। এর চেয়ে লাঞ্ছনা আর কি হতে পারে!

অনেক দা'ঈ যা শুনেন বা পড়েন তাই হাদীসরূপে বলেন। আমরা দেখলাম যে, হাদীসের নামে মিথ্যাচারের জন্য এটাই যথেষ্ট। কোনো হাদীস গ্রন্থে হাদীস পড়লেও তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চত না হয়ে তা বলা উচিৎ নয়। বড়জোর বলা যায় যে, অমুক গ্রন্থে হাদীসটি আছে, এর সনদের বিষয় আমি ভালো জানি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বা হাদীসে আছে এ কথাটি উচ্চারণের পূর্বে মুমিনের উচিৎ শতবার চিন্তা করা।

অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থের সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কথিত বা প্রচারিত শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সকল হাদীস সনদ সহকারে সংকলন করা, যেন মানুষেরা সনদের আলোকে তা বিচার করে গ্রহণ করতে পারে। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস ঢালাও সংকলন না করে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন করার চেষ্টা করেন। বুখারি ও মুসলিমের সকল হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ সংকলিত অধিকাংশ হাদীস সহীহ বা হাসান। তবে এগুলোতে অনেক দুর্বল হাদীসও রয়েছে, যেগুলোর দুর্বলতার কথা সংকলকগণ নিজেরাই উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য হাদীসগ্রন্থগুলোতে সহীহ, জয়ীফ, মাউযু সকল প্রকারের হাদীস সংকলিত করা হয়েছে।

আমরা অনেক সময় ভাবি যে, অমুক বুজুর্গ হাদীসটি লিখেছেন, তিনি কি বিচার না করেই লিখেছেন?! এ চিন্তা ঠিক নয়। কোনো বুযুর্গ যদি তাঁর গ্রন্থে কোনো হাদীস লিখে হাদীসটি সহীহ বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন তাহলে তার রিফারেন্সে হাদীসটি বলা যেতে পারে। নইলে শুধুমাত্র কোনো গ্রন্থে আছে বলেই কোনো হাদীস বলবেন না। হাদীসটি কোন হাদীস গ্রন্থে সংকলিত এবং হাদীসটির সনদ সহীহ বা গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চত না হওয়া পর্যন্ত কোনো হাদীস বর্ণনা না করাই মুমিনের জন্য নিরাপদ। কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রত্যেককেই নিজ কর্মের হিসাব নিজেই দিতে হবে।

ফযীলতের ক্ষেত্রে দ'ঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যায় বলে প্রচলিত একটি কথা আমাদেরকে অনেক সময় বিভ্রান্ত করে। দ'ঈফ হাদীসের ওপর আমল করা আর দ'ঈফ হাদীসকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলে প্রচার করা এক নয়। অনেক আলিম কতকগুলো শর্ত সাপেক্ষ ফযীলতের ক্ষেত্রে দ'ঈফ হাদীসের ওপর আমল করা জায়েয বলেছেন। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(১) দ'ঈফ হাদীসটি খুব বেশি দ'ঈফ বা দুর্বল হবে না।

(২) দ'ঈফ হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা বলে মনে নিশ্চিত করা যাবে না। সাবধানতামূলকভাবে আমল করতে হবে। অর্থাৎ মনে করতে হবে, হাদীসটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা হতেও পারে, কাজেই পারলে আমল করি।

অন্য অনেক আলিম দ'ঈফ হাদীসের ওপর আমল করতে নিষেধ করেছেন। যেখানে অসংখ্য সহীহ হাদীসে নির্দেশিত কর্ম করার সময়ই

অধিকাংশ মুসলিম পান না, সেখানে এ সকল দ‘ঈফ হাদীস বিবেচনা করা ঠিক নয়। এছাড়া তারা বলেন যে, যারা দ‘ঈফ হাদীসের ওপর আমল করা জায়েয বলেছেন তারা শর্ত করেছেন যে, বিশ্বাস বা আকিদাগত বিষয়ে কখনই দ‘ঈফ হাদীসের ওপর নির্ভর করা যাবে না, শুধুমাত্র কর্মের ক্ষেত্রে সাবধানতামূলক কর্ম করা যাবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো বিশ্বাস ও কর্ম বিচ্ছিন্ন করা মুশকিল। কারণ, দ‘ঈফ হাদীসের ওপর আমল করছেন তিনি অন্তত বিশ্বাস করছেন যে, এই আমলের জন্য এই ধরনের সাওয়াব পাওয়া যেতে পারে। এজন্য এঁদের মতে দ‘ঈফ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা নয় বলেই বিবেচিত, তার পিছনে শ্রম ব্যয় অর্থহীন। সর্বাবস্থায় সকল আলিম ও মুসলিম উম্মাহ একমত যে, মওযু বা বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করা বা তার ওপর আমল করা একেবারেই নিষিদ্ধ ও হারাম।

ব্যাখ্যাকে ওহীর সাথে সংযুক্ত করা

ওহীর নামে মিথ্যা বলার আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে, আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তার তাফসীর বা ব্যাখ্যাকে ওহীর অংশ বানিয়ে দেওয়া, যাতে শ্রোতা বা পাঠকের কাছে মনে হয়, ব্যাখ্যাও বোধহয় আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা।

ওহী আল্লাহর বাণী। আর তাফসীর বা ব্যাখ্যা মানুষের কথা। কোনো ব্যাখ্যাই ওহী নয়। কাজেই ব্যাখ্যাকে ওহী থেকে পৃথক রাখতে হবে। এছাড়া ওহীর ব্যাখ্যা অবশ্যই সুন্নাতের আলোকে করতে হবে। নিজেদের

পছন্দ অনুযায়ী করলে তা অপব্যাখ্যায় পরিণত হবে। দা'ওয়াতে রত অনেক মুমিন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ অন্যায়ের মধ্যে নিপতিত হন। কুরআন হাদীসের বাণীগুলোর তরজমা করার সময় আমরা আমাদের পদ্ধতির আলোকে এমনভাবে অনুবাদ করি যেন বাণীটি আমাদের পদ্ধতিই সমর্থন করছে। যেমন জিহাদ বা কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ বিষয়ক আয়াতগুলো আমরা আমাদের পছন্দমত আত্মশুদ্ধির চেষ্টা, আন্দোলন বা দা'ওয়াত অর্থে অনুবাদ করি। আমাদের উচিৎ অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে সর্বদা পৃথক রাখা।

অনুবাদের ক্ষেত্রে সংযোজন বা বিয়োজন

ওহীর নামে মিথ্যা বলার তৃতীয় পদ্ধতি হলো, অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক অনুবাদ না করে অনুবাদের সাথে নিজের মনমত কিছু সংযোগ করা বা কিছু বাদ দিয়ে অনুবাদ করা। যেমন আমরা বলি, কুরআনে আছে , আদম যখন গন্দম ফল ভক্ষণ করলেন.... এখানে গন্দম ফল কথাটি অতিরিক্ত যা কুরআনে বা হাদীসে কোথাও নেই। অনুরূপভাবে আমরা বলি, কুরআনে আছে, যখন জুলাইখা ইউসুফকে আ. বললেন.... (যুলাইখা) নামটি আমাদের কথা, কুরআনের কথা নয়। অনুবাদের সময় নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিছু বাদ দেওয়াও একই পর্যায়ের অপরাধ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সর্বাবস্থায় আক্ষরিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এরপর আমাদের ব্যাখ্যা, শিক্ষা ইত্যাদিকে পৃথকভাবে উপস্থাপিত করতে হবে।

দীনের নামে অনুমান নির্ভর মতামত বা ফতওয়া দেওয়া

ওহীর নামে মিথ্যা বলার চতুর্থ পদ্ধতি হলো, আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে আন্দাজ-অনুমানের ওপর কিছু বলা। অধিকাংশ সময় আমরা আন্দাজেই বলি, এ ঠিক নয়, এ ইসলামে থাকতে পারে না, এ জায়েয হতে পারে না ইত্যাদি। আমরা অনেক সময় এক দু'টি আয়াত বা হাদীসের ওপর নির্ভর করেই বলে ফেলি, অমুক বিষয় হারাম, বা অমুক বিষয় ইসলামে নেই। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আমরা যতটুকু জানি ততটুকুই বলব নইলে বলব, এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানি না।

গল্প নির্ভর ওয়াজ

আমরা দেখেছি যে, দা'ওয়াতের একটি মাসনূন উপকরণ হলো ওয়াজ। ওয়াজ অবশ্যই কুরআন ও হাদীস নির্ভর হবে। ওয়াজের নামে মিথ্যা হাদীস, বানোয়াট গল্প বা পূরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের নামে প্রচারিত অনির্ভরযোগ্য বা সনদ বিহীন কাহিনী বলার অগণিত ক্ষতির একটি হলো, কুরআন, হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ থেকে মুসলিম উম্মাহকে দূরে সরিয়ে দেওয়া।

ঝগড়া নির্ভর বিতর্ক

দা'ওয়াতের জন্য, বিভিন্ন দা'ওয়াত কেন্দ্রিক দলের মধ্যে বা দা'ওয়াত বিরোধীদের সাথে আলোচনা বা বিতর্কের নামে ঝগড়া, বহস, বিদ্বেষমূলক বির্তক, হিংসা বা ঘৃণা প্রচার ইত্যাদি কঠিন হারাম কর্ম যেন না ঘটতে পারে সে দিকে দা'ওয়াতরত মানুষদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এখানে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে।

প্রথমত, সূরা আল-'আনকাবুতের ৪৬ আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আহলে কিতাব বা ইয়াহূদী-নাসারাদের সাথেও উত্তমভাবে ছাড়া বিতর্ক না করতে। তাহলে মুসলিমদের সাথে বিতর্কের আদব কেমন হতে পারে?

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে বারংবার বিতর্ক পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ গ্রন্থেও আমরা এ অর্থে একাধিক হাদীস দেখেছি। যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক জেনেও বিতর্ক পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে বাড়ি বানিয়ে রাখবেন বলে তিনি বলেছেন। অন্যান্য হাদীসে দীন নিয়ে ঝগড়া বিতর্ক বিভ্রান্তির কারণ বলে তিনি জানিয়েছেন।

তৃতীয়ত, বহস বা ঝগড়া মানুষের সত্য গ্রহণের পথে বড় বাধা। বিতর্কের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ একটি মত গ্রহণ করে সে পক্ষে বিতর্ক করেন। বিতর্কে হেরে গেলেও তারা তা মানতে চান না। কারণ, বিষয়টি অহংবোধ ও মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। মুমিনদের দায়িত্ব হলো খোলা মনের আলোচনার মাধ্যমে সঠিক বিষয় জানার চেষ্টা করা। তা সম্ভব না হলে বিতর্ক এড়িয়ে নিজের কাজ করা ও ভিন্নমতাবলম্বীদের জন্য দো'আ করা আমাদের দায়িত্ব।

হিকমতের নামে অবৈধ কর্ম

হিকমত-এর নামে ইসলামে নিষিদ্ধ কোনো মাধ্যম ব্যবহার করা যায় না। কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে কোনো পাপ, অন্যায় বা নিষিদ্ধ কর্ম করা ইসলামে

বৈধ নয়। মিথ্যা বলা, মদপান করা, ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মকে হিকমত বলে দা'ওয়াতের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার বৈধ নয়।

জিহাদ বা কিতালের নামে মারামারি বা হত্যা

জিহাদ-কিতালের নামে মারামারি বা হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া বা আইন ও বিচার নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি। কুরআন-হাদিসে যেমন বিভিন্ন ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি ইবাদতের জন্য শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। অগণিত স্থানে সালাতের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি দু-একটি স্থানে কিবলা, পবিত্রতা, সতর, সময়, নিয়ত ইত্যাদি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি এ সকল শর্ত অবজ্ঞা করে ইচ্ছামত সালাত পড়তে থাকেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

জিহাদ কিতালের ক্ষেত্রেও তেমনি অগণিত স্থানে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি কোথাও কোথাও জিহাদের জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রীয় ঘোষণা, সন্ধি, আত্মসমর্পণ বা জিযিয়ার সুযোগ প্রদান ইত্যাদি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল শর্তের বাইরে জিহাদ করলে তা ইবাদত হবে না, বরং ইসলাম বিরোধী কর্ম বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে কারো বিরুদ্ধে মারামারি, খুনাখুনি, বিচার বা শাস্তি কখনই জিহাদ নয়। এগুলো ইসলাম নিষিদ্ধ ফাসাদ, ফিতনা, সন্ত্রাস, হত্যা ও মানুষের ক্ষতি ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই অমুক ব্যক্তি ইসলামের বিরোধিতা করছে, দা'ওয়াতের বিরোধিতা করছে বা ইসলাম বিরোধী কথা বলেছে কাজেই সে ইসলামের শত্রু এবং

তাকে শাস্তি দিতে হবে বা তার বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান প্রয়োগ করতে হবে এই আবেগপ্রসূত চিন্তা মুমিনকে বিভ্রান্তি ও সার্বিক ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করবে। এ বিষয়ে ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ গ্রন্থটি পড়তে পাঠককে অনুরোধ করছি।

দা‘ওয়াতের আধুনিক উপকরণ

মিডিয়া, মিছিল, হরতাল ইত্যাদি আধুনিক উপকরণ

দা‘ওয়াতের জন্য যে সকল আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা হয় বা করা যায় সেগুলোর অন্যতম হলো কুরআন সুন্নাহ, ওয়াজ, ন্যায়ের জন্য উৎসাহ, অন্যায়ের ব্যাপারে আপত্তি ইত্যাদির জন্য পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য আধুনিক উপকরণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার এবং মিছিল, হরতাল, ধর্মঘাট, মানববন্ধন, নির্বাচন ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা।

আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের শর্তাবলী

এ সকল উপকরণের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

প্রথমত, এ উপকলণগুলো ইসলামের বিধি-বিধানের পরিপন্থী না হলে তা প্রয়োজন ও সুযোগমত ব্যবহার করা যাবে। তবে সেগুলোকে কখনই দীনের বা ইবাদতের অংশ মনে করা যাবে না। কেউ সেগুলো ব্যবহার না করলে তাকে নিন্দা করা বা তার দা‘ওয়াতের ইবাদত পালনে ত্রুটি হচ্ছে বলে মনে করার অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন অনুসারেই তা ব্যবহার করতে হবে। এ সকল উপকরণের ব্যবহারে অমুসলিম সম্প্রদায়ের অন্ধ অনুকরণ অবশ্যই বর্জনীয়।

তৃতীয়ত, এ সকল উপকরণের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইসলামি আখলাকের পূর্ণ উপস্থিতি আবশ্যকীয়। আন্তরিকতা, ভালোবাসা, বিনম্রতা, বন্ধুভাবপন্নতা, উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয় সকল অবস্থায়

পালনীয়। গীবত, ঢালাও অভিযোগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বর্জনীয়। অনেক সময় আমরা ওয়াজ, দা'ওয়াত, তাফসীর, খুতবা ইত্যাদির সময় ইসলামি আখলাকের অনুসরণ করি। পক্ষান্তরে নির্বাচন, জনসভা, মিছিল ইত্যদির সময়ে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ করি। এগুলোতে আমরা কাফির-ফাসিকদের মত জ্বালাও পোড়াও, ভেঙ্গে ফেল, গুড়িয়ে দাও ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার, চিৎকার, লাফালাফি, গালাগালি, হাতে তালি ইত্যাদি ইসলাম নিষিদ্ধ কর্ম করে থাকি। মনে হয় এগুলোতে ইসলাম পালনের প্রয়োজন নেই বা এগুলো ইসলামি কায়দায় করা যায় না। কাফির-ফাসিকদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও মুমিনের দা'ওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠা কখনই একই আখলাকের হতে পারে না।

হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, কুশপুত্তলিকা

আধুনিক উপকরণগুলো অবশ্যই ইসলামি বিধি-বিধানের আওতায় ব্যবহার করতে হবে। দা'ওয়াত, আদেশ, নিষেধ বা প্রতিবাদের নামে ইসলাম নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা যায় না। হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ এ জাতীয় একটি আধুনিক উপকরণ, যা পাশ্চাত্য জগত থেকে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং অনেক সময় পাশ্চাত্যের অনুকরণে ইসলাম বিরোধীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যদি কোনো সমাজে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের মতামত প্রকাশের জন্য মিছিল, হরতাল ইত্যাদির প্রচলন ও স্বীকৃতি থাকে তাহলে সে সমাজের দা'ঈগণ দা'ওয়াতের বা আদেশ নিষেধের জন্য হয়ত তা ব্যবহার করতে পারেন, তবে তা অবশ্যই স্বতস্ফূর্ত ও ঐচ্ছিক হলে।

হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, প্রতিবাদসভা ইত্যাদির নামে রাস্তাঘাট বন্ধ করা, কাউকে কষ্ট দেওয়া, জোরপূর্বক অংশগ্রহণ করানো, জানমালের ক্ষতি করা, কর্মস্থলের অধিকার নষ্ট করা ইত্যাদি সবই কঠিন হারাম কর্ম। অনুরূপভাবে মুর্তি, কুশপুত্তলিকা বা কার্টুনমুর্তি তৈরী করা, ফাঁসি দেওয়া, পোড়ানো ইত্যাদিও ইসলাম নিষিদ্ধ কর্ম। এগুলো পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া কিছুই নয়। পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে হরতালের সময় কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ কাজ বন্ধ করে দেন। ইসলামের নির্দেশে কর্মচারী বা কর্মকর্তার সাথে চুক্তি মোতাবেক পরিপূর্ণ সময় কর্ম করতে বাধ্য। তিনি তাঁর চুক্তি বাতিল করতে পারেন, কিন্তু চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ করতে পারেন না। তাহলে যুলুম ও মানুষের হক নষ্ট করার পাপে পতিত হবেন। তিনি তার কর্মদাতার অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেন। কিন্তু পাপের মাধ্যমে নয়। কর্মদাতার অন্যায়ের ক্ষেত্রেও তিনি কর্ম না করে টাকা নিতে পারেন না। আইনানুগ পদ্ধতিতে অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারেন। তাহলে যেক্ষেত্রে কর্মদাতার কোনো অন্যায় নেই, রাষ্ট্রের বা অন্য কারো অন্যায়ের প্রতিবাদ তিনি চুক্তির খেলাফ করে কাজ না করে বসে থাকবেন কীভাবে?

এছাড়া এ জাতীয় কর্ম অনেক সময় উম্মতের জন্য ক্ষতিকর। আমেরিকা বা ইসরাইলের কোনো একটি অন্যায়ের প্রতিবাদে বাংলাদেশের মানুষ একদিন হরতাল-ধর্মঘট পালন করলে ইয়াহূদীদের কোনো ক্ষতি হবে না। ক্ষতি হবে বাংলাদেশের, রাষ্ট্রের ও জনগণের। এরূপ কর্ম কখনই শরী‘আতে বৈধ হতে পারে না এবং কোনো অবস্থাতেই ন্যায় প্রতিষ্ঠার বা অন্যায়ের প্রতিবাদের ইসলামি মাধ্যম হতে পারে না। বিশ্বের যে কোনো

স্থানে মাযলুম মানুষ ও প্রাণীর প্রতি সমবেদনা ও যুলুমের নিন্দা করা মুমিনের দায়িত্ব। তবে তা ইসলামি আখলাক ও পদ্ধতির আওতায় করতে হবে। গণমাধ্যমের ব্যবহার, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, যালিমের কাছে প্রতিবাদ পাঠানো, মযলুমের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা ইসলাম সম্মত।

পাশ্চাত্য স্টাইলে জাগতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত মানুষেরা স্বভাবতই হালাল হারামের তোয়াক্কা করবে না। কিন্তু দা'ওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার কর্মে লিপ্ত মুমিনকে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ, বান্দার হক্ক ইত্যাদির বিষয় গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রতিটি কাজের জন্য একদিন আল্লাহর দরবারে চুলচেরা হিসাব দিতে হবে। এ দুনিয়ার সামাজিক জীবনে এ সকল হক নষ্ট করা হয়ত আমরা খুবই হালকাভাবে দেখি। কারণ, কোনো অন্যায় সবত্র ঘটতে দেখলে তা গা সওয়া হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর হিসাবে আমরা পার হতে পারব কি?

উপকরণ বনাম ইবাদত: বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি

প্রাচীন যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দা'ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি, দল ও মতের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয়। প্রত্যেকেই কুরআন ও হাদীস থেকে নিজেদের কর্মের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি যুগ ও পরিবেশের চাহিদা মোতাবেক কিছু নতুন পদ্ধতি সংযোজন করেছেন। সাধারণভাবে এ সকল পদ্ধতি ইবাদত হিসেবে চালু করা হয়

নি। ইবাদত পালনের সহায়ক উপকরণ হিসাবেই এগুলোকে চালু করা হয়েছে। কিন্তু কালের আবর্তনের সাথে সাথে এ সকল পদ্ধতির অনুসারীরা এসকল পদ্ধতিকে ইবাদতের অংশ বলে মনে করে বিভ্রান্তি ও দলাদলির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন।

এ সকল নব উদ্ভাবিত দল বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়:
প্রথমত, মাসনূন উপকরণগুলো প্রয়োজন অনুসারে খেলাফে সুন্নাতভাবে সীমিত করা বা নির্ধারিত করা। যেমন, কুরআন-হাদীস, ওয়াজ ইত্যাদির মাধ্যমে দা'ওয়াত প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সিলেবাস-পাঠ্যক্রম, সময়, স্থান বা পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেন নি। এ সকল উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে প্রয়োজন অনুসারে তা নির্ধারিত করা হয়েছে। নির্ধারিত গ্রন্থাবলী পড়ার বা নির্ধারিত দিন, মাস বা বছর ধরে বা নির্ধারিত সময়ে বা স্থানে দাওয়াতি কর্ম করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এগুলোর মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে খলাফে সুন্নাত বা সুন্নাত বহির্ভূত নতুন কিছু উপকরণ বা পদ্ধতি সংযুক্ত করা হয়েছে।

অনেক সময় এ প্রকারের সংযোজন বা নির্ধারণের জন্য কুরআন হাদীস থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়। যেমন, আল্লাহ রমযানে একমাস সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কাজেই আমরা আমাদের দা'ওয়াতের কোর্স একমাস নির্ধারণ করেছি। এর মধ্যে বিশেষ বরকত পাওয়া যাবে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ দিন ইতিকাফ করতেন, এজন্য আমরা আমাদের ওয়াজ মাহফিল দশদিন ব্যাপি করেছি। অথবা

তিনি হিজরত করে চিরস্থায়ীভাবে মক্কা শরীফ ত্যাগ করে মদিনায় গমন করেছিলেন, এজন্য আমরা দা'ওয়াত, ওয়াজ বা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য এক দেশের মানুষকে হিজরত করে অন্য দেশে স্থায়ী বসবাসের ব্যাবস্থা করি। অথবা তিনি হজের সময় ইহরামের কাপড় পরিধান করতেন, এজন্য আমরা দা'ঈদেরকে দা'ওয়াতের সময় ইহরামের কাপড় পরিধান করার ব্যবস্থা করেছি।

এ প্রকারের অনুপ্রেরণার ভালো দিক থাকলেও তা বহু বিদ'আত ও সুন্নাত বিরোধিতার জন্ম দেয়। যেমন, সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন বা উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতের জন্য তিনি এরূপ কোনো নির্দেশ বা উৎসাহ দেন নি। তিলাওয়াতের ইবাদত তিনি উন্মুক্তভাবে পালন করেছেন। বসে বা দাঁড়িয়ে যে কোনো অবস্থায় তিলাওয়াত করলে সমান সাওয়াব পাওয়া যাবে। এখন যদি কেউ মনে করেন যে, সালাতের জন্য দাঁড়ানো ফরয বা উত্তম, অতএব তিলাওয়াতও দাঁড়িয়ে করা উত্তম বা দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করলে অতিরিক্ত সাওয়াব বা বরকত পাওয়া যাবে, তবে তিনি খেলাফে সুন্নাত একটি কর্মকে ইবাদতের অংশ মনে করে বিদআত করলেন ও সুন্নাত বিরোধিতায় লিপ্ত হলেন।

আমি এহইয়াউস সুনান গ্রন্থে সুন্নাত থেকে বিদ'আতে উত্তরণের বিভিন্ন কারণ ও পদ্ধতির আলোচনা করেছি। গ্রন্থটির পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম পদ্ধতির আলোচনায় উপকরণকে ইবাদত মনে করার বিভিন্ন প্রবণতা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি পাঠককে আবারো সবিনয় অনুরোধ

করছি বইটি পড়তে। এখানে শুধুমাত্র একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমান সময়ে অনেক নেককার মুমিন দা'ওয়াতের কাজে রত রয়েছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে দা'ওয়াতের মাধ্যমে সমাজের সর্বত্র ইসলামকে প্রতিপালিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। এ সকল কাজের মধ্যে পার্থক্য:

প্রথমত, নাম ও পরিভাষা ব্যবহারে। তাযকিয়া, আন্দোলন, ইকামতে দীন, তাবলীগ, জিহাদ, মাদ্‌রাসা, ওয়াজ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু নির্ধারণে। ঈমান-আক্বীদাহ, শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি, ব্যক্তিগত কর্ম, সমাজ সেবা, রাজনৈতিক পরিবর্তন ইত্যাদি একেক দল একেক বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

তৃতীয়ত, পদ্ধতিতে। বিভিন্ন দল বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করছেন। পদ্ধতিগুলো কোনোটিই হুবহু মাসনূন পদ্ধতি নয়।

এ সকল পদ্ধতিতে দা'ওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠায় রত অনেকেই এ সকল খেলাফে সুন্নাত বা সুন্নাত বহির্ভূত পদ্ধতি ও উপকরণকে মূল ইবাদত দা'ওয়াত এর অংশ মনে করছেন এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হচ্ছন।

প্রথমত, একে অন্যের দা'ওয়াতের ইবাদত পালিত হচ্ছে না বলে মনে করছেন। কেউ হয়ত ওয়াজ, গ্রন্থ রচনা, মাদ্‌রাসা ইত্যাদি মাধ্যমে দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করছেন, কিন্তু অন্য পদ্ধতির দা'ঈ ভাবছেন,

যেহেতু তিনি আমার পদ্ধতিতে কাজ করছেন না, সেহেতু তার দা‘ওয়াতের ইবাদত পালিত হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় একে অন্যের কোনো ইবাদতই হচ্ছে না বলে মনে করছেন। যেহেতু ঐ ব্যক্তির দা‘ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠা নামক ইবাদত পালিত হচ্ছে না, সেহেতু তার অন্য কোনো ফরয, সুন্নাত ও নফল ইবাদত কবুল হচ্ছে না। কাজেই আমার পদ্ধতির বাইরে যারা রয়েছেন তাদের সালাত, সাওম, হজ, যিকির, তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সবই মূল্যহীন বা অপূর্ণ।

এ সকল বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ হলো নব উদ্ভাবিত খেলাফে সুন্নাত উপকরণ বা পদ্ধতিকে মূল ইবাদতের অংশ মনে করা। আমাদের উচিৎ পদ্ধতির চেয়ে মূল ইবাদতের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখা, নিজের ইবাদত কবুল হচ্ছে কিনা সেদিকে বেশি লক্ষ্য রাখা এবং সকল মুসলিম ও সকল দা‘ঈকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা।

সবচেয়ে দুঃখজনক হলো এ সকল কারণে দলাদলির জন্ম নেওয়া। কুরআন ও হাদীসে উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক বা দলাদলি কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামি আকিদা গ্রন্থে আমি এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইসলামে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু দলভেদ থাকতে পারে না। বস্তুত আমাদের একটিই দল আছে, তার নাম ইসলাম। সকল মুসলিম আল্লাহর দল এবং সকল কাফির শয়তানের দল। শয়তানের দলকে মুমিন অন্য দল বলে মনে করেন। কোনো মুসলিমকে অন্য মুসলিম অন্য

দল বলে মনে করতে পারেন না। পদ্ধতিগত বা মতামতগত পার্থক্যের কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দলাদলি ও বিভক্তি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়।

শেষ কথা

সম্মানিত পাঠক, দা'ওয়াতের পূর্ণতা, কবুলিয়্যাত ও সফলতার জন্য দা'ঈ-মুবাল্লিগদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, মহব্বত ও ঐক্য প্রয়োজন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে দীন প্রতিষ্ঠা করতে এবং দলাদলি-মতভেদ না করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমরা দলাদলি মতভেদে লিপ্ত রয়েছি। আমরা সকলেই ঐক্যের কথা বলছি। কিন্তু ঐক্য হচ্ছে না কেন?

অনেক কারণ থাকতে পারে। একটি কারণ হলো, আমরা প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্বের চেয়ে অন্যের দায়িত্বের কথা বেশি চিন্তা করছি। প্রত্যেকেই মনে করছি, এ বিভক্তি বা বিচ্ছিন্নতার জন্য আমি বা আমার দল দায়ী নয়, বরং অমুক বা তমুক দায়ী। তবে প্রকৃত কথা হলো আমরা সকলেই কমবেশি অপরাধী। আমাদের প্রয়োজন, নিজের দায়িত্বের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখা। অন্যেরা আমার বিরুদ্ধে যাই করুক, আমি সকল দা'ঈকে ভালোবাসব, সবাইকে আমার আন্দোলনের কর্মী ও আমার কাফেলার সাথী বলে মনে করব। সম্ভব হলে তাদের ভুলত্রুটি ভালোবেসে সংশোধনের চেষ্টা করব। নইলে আল্লাহর কাছে তাদের সংশোধনের দো'আ করব। নিজের দায়িত্ব পালনে আমি সচেষ্ট থাকব।

ঐক্য বলতে সকল দা'ঈ একই মাদ্রাসায় পড়াবেন বা একই পদ্ধতিতে দা'ওয়াত দিবেন বলে আমরা আশা করতে পারি না। একই শহরে

কুরআন শিক্ষার বিভিন্ন কারিকুলাম ও পদ্ধতির অনেকগুলো মাদ্‌রাসা থকতে পারে। সবারই উদ্দেশ্য কুরআন শিক্ষা। তবে পদ্ধতির ত্রুটি ও শিক্ষকদের আমলের ত্রুটি থাকতে পারে। তা সত্বেও সকলের মধ্যে মহব্বত ও একই কাফেলার সহযাত্রীর অনুভূতি থাকা প্রয়োজন। সম্ভব হলে পরস্পরে ভুলত্রুটি ভালোবেসে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। না হলে কুরআনের খাদেম হিসাবে ত্রুটিসহই ভালোবাসতে হবে। না হলে প্রত্যেকে নিজের মতো কাজ করতে হবে। কিন্তু যদি সকল মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকগণ সর্বদা পরস্পরের পদ্ধতি ও কর্মের দোষত্রুটির সন্ধান, আবিস্কার ও প্রচারে ব্যস্ত থাকেন তাহলে কি কুরআনের খিদমত ভালোভাবে হবে?

মহান আল্লাহ দয়া করে দা‘ওয়াতের ময়দানে কর্মরত সকলের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন, তাঁদের প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং সর্বোত্তম পুরুস্কার প্রদান করুন। দা‘ওয়াত বিষয়ক এই ক্ষুদ্র আলোচনার এখানেই ইতি টানছি। এর মধ্যে যদি কোনো কল্যাণকর কিছু থাকে তবে তা আমার করুণাময় প্রতিপালক আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর একান্ত দয়া। আর এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি যা আছে তা সবই আমার নিজের দুর্বলতা ও শয়তানের প্রবঞ্চনার কারণে। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সকল প্রসংশাই তাঁর। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয়তম হাবিব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীগণের ওপর।

সমাপ্ত

আল্লাহর পথে আহ্বান সব থেকে বড় আমল। কেননা তা নবী-রাসূলদের দায়িত্ব। আর নবী-রাসূলগণ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহর পথে আহ্বান আল্লাহকে ও নবীকে জানার পথ দেখায়। শুধু তাই নয় বরং আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এ কর্মের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি থেকে কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর পথে আহ্বান করল এবং সৎ কাজ করল। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে দাওয়া বিষয়ক কিছু মূল্যবান আলোচনা এসেছে, যা সবার উপকারে আসবে বলে আশা করি।